ধূপচ্ছায়া

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৩১৯
দশ আনা

প্রকাশক
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস,
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

কান্তিক প্রেস
২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা,
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

এই পুস্তকের প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অঙ্কিত। উহা ব্যবহার করিবার অধিকার পাওয়াতে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

যে

ধূপছায়ার মতো স্নিগ্ধ সুন্দর

তাহাকে

এই পুষ্পিত ও মুকুলিত অন্তর-বেদনার

অর্ঘ্য

ধূপছায়া

দিলাম।

সূচী

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

সওগাত — ||০

ছোট গল্পের বই। গল্পকাব্য।

পুষ্পপাত্র — ||৵০

ছোটগল্পের বই। ফুলের মতো রঙিন, ফুলের মতো সৌরভময়।

রত্নাবলী — |৵০

সংস্কৃত নাটকের উপাখ্যান। বর্ণনার ঐশ্বর্য্য, চরিত্রের মাধুর্য্য, ও ঘটনার কৌশলের জন্য এই গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধ।

কাদম্বরী — ||৵০

নিপুণ বর্ণচিত্রের জন্য গ্রন্থখানি বিখ্যাত। সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ও শ্রেষ্ঠশিল্পী যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত চিত্র সম্বলিত।

পারস্যোপন্যাস — ৸০

সুরুচিসঙ্গত। সুচিত্রমণ্ডিত ও বাঁধানো।

রবিন্সন ক্রুসো — ১|০

সচিত্র ও সম্পূর্ণ।

মহাভারত — ৩৲

কাশীরাম দাসের অষ্টাদশ পর্ব্ব। সচিত্র ও সটীক।

বিষ্ণুপুরাণ — ||৵০

প্রসিদ্ধ শিল্পীদিগের চিত্রে সুশোভিত।

অপরাজিতা

তাহার নাম বসন্ত। সে কাশীর রাজার অন্তঃপুরের মালাকর।

একদিন বসন্তপ্রভাতে অখ্যাত অজ্ঞাত তরুণ সুপুরুষ সে যখন রাজার সভায় কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন তাহাকে দেখিয়া সভাসদের ঈর্ষাকুটিল মন প্রীতিরসে অভিষিক্ত হইয়াছিল, বৃদ্ধ মন্ত্রীর সন্দিগ্ধ গম্ভীর চিত্ত স্নেহস্পর্শে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, রাজার চক্ষু প্রশংসাপুলকে বিস্ফারিত হইয়াছিল, আর রাজসভার একান্তে গজদন্তের চকচকে চিকের আড়ালে তরুণীদের চটুল চোখের চাহনিতে পলক পড়ে নাই।

রাজা সাদর অভ্যর্থনায় তাহাকে সভায় বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে যুবক, কোন্ দেশের কোন্ পরিবারকে সুখী করিয়া তুমি জন্মিয়াছ? কুসুম-সুকুমার তোমার কান্তি, তুমি কোন্ কাজ করিবে? তোমার কোনো কাজ করিতে হইবে না, তুমি আমার রাজসভা আনন্দে উজ্জ্বল করিয়া থাক।

বসন্ত মূর্ত্তিমান বিনয়ের মতো মাথা নত করিয়া রাজপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া ধীর দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—মহারাজ, কর্ম্মহীনের ক্লান্তি হইতে আমায় রক্ষা করুন। আমার সামান্য শক্তি মহারাজের সেবায় নিযুক্ত হোক।

স্মিত মুখে প্রীত রাজা বলিলেন—বেশ যুবক বেশ! কোন্ কর্ম্ম তোমার প্রীতিকর? মন্ত্রী, সেনাপতি, সভাকবি, যে-কেহ তোমায় সহকারী পাইলে সুখী হইবেন। বল, তোমার কোন্ কর্ম্ম রুচিকর?

বসন্ত হাত জোড় করিয়া বলিল—মহারাজ আমি অক্ষম; গুরু ভার আমার উপর দিবেন না। আমি মহারাজের খাস বাগানের মালী হইব; নিত্য নূতন ফুলের মালায় মহারাজের পূজা করিব; বীণার গানে সকাল সন্ধ্যা মহারাজের বন্দনা গাহিব। আর আমি কিছু চাহি না।

সকলে মনে করিল এমন সুন্দর রূপ ইহার, কিন্তু এ পাগল। রাজা এই পাগলকে দয়া করিয়া তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। সে সেইদিন হইতে রাজার খাস বাগানের মালী হইল।

ফুলের-ফরাস-বিছানো বাগানখানির একটি কোণে ফুলের-পাড়-বোনা পাতায়-ঘেরা কুটীরখানিতে তাহার বাসা। সেখানকার গাছগুলি সব ফুলের মোহন স্বপন দেখে, কোকিলকণ্ঠে কথা বলে। আর বসন্ত সকাল সন্ধ্যা বীণার তারে যে গান বাজায় তাহার সুরে আকাশ বাতাস মদির হইয়া উঠে; রাজপ্রাসাদের ঘরে ঘরে সে গান গিয়া প্রীতি আনন্দ বিলাইয়া ফিরে। সকাল বিকাল সে নানান্ ফুলে বিনাইয়া বিনাইয়া যে-সব বিনোদমোহন হার গাঁথে সে-সব মালা গলায় গলায় পুলক-পরশে হরষ জাগায়। দম্পতির মিলন মধুর হয়, দৃঢ় হয়। আর যাহারা তরুণ তরুণী অপরিণীত, তাহাদের প্রাণ অচেনা প্রিয়ের প্রণয়বেদনায় পীড়িত হয়, বিরহ-ব্যথায় ব্যাকুল হয়।

সকাল বিকাল নূতন মালীর ভক্তিদান পাইবার জন্ত রাজ

কুমারীরা যখন গোলাপ-কেয়ারীর ফাঁকে ফাঁকে বকুলবীথির তলে তলে মণিশিলার পথে পথে অরুণরাঙা চরণ ফেলিয়া মালীর কুটীরের কাছে ভিড় করিয়া জমিত, তখন সমস্ত বাগান খুসি হইয়া উঠিত, গাছে গাছে রূপযৌবনের ঢেউ লাগিয়া ফুলের মুখে হাসি ফুটিত, কলহাস্যে কোকিল পাপিয়ার কণ্ঠ খুলিত। আর বসন্ত? পত্রপুটে তাজা ফুলের শিশিরভিজা মালার ভেট আনিয়া সে আপনার সেবাবৃত্তি সার্থক করিত।

সে কত ছন্দের কত ফুলের মালা! কুমারী ইন্দিরার জন্য অম্লান ইন্দীবরের মালা! কুমারী শুক্লার জন্য প্রফুল্ল গোলাপের গোড়ে! কুমারী আনন্দিতার জন্য বেলযূঁইগন্ধরাজের অনিন্দিত হার! পাঁচনর, সাতনর, শতনর!

ইহাদের সকলের পশ্চাতে আসিত আর একজন। কালো কুৎসিত সে। সে রাজকন্যা যমুনা!

চাঁদের বুকে কলঙ্কের মতো সুন্দরীদের মাঝখানে তাহার রূপ-হীনতা বেশি করিয়া চোখে লাগিত। যমুনা নিজে বুঝিত; আপনাকে সে লুকাইতে পারিলে বাঁচিত। মলমলের গোলাপী শাড়ীর আঁচলখানিতে নিবিড় করিয়া আপনাকে সে ঢাকিতে চাহিত, সকলের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য সকলের পশ্চাতে থাকিত। চক্ষের পলক তাহার লজ্জিত, চরণ তাহার কুণ্ঠিত, কণ্ঠ তাহার মৃদু, হৃদয় তাহার ভীরু। পদে পদে সবার কাছে তাহার লজ্জা, সবার দৃষ্টি হাসি তাহার লজ্জায়, সবার সঙ্গ তাহার লজ্জায়। যে রূপহীনা। বিধাতা তাহার অঙ্গে অঙ্গে দারুণ পরাভব আঁকিয়া াছেন—তাহা আর লুকাইবার ঢাকিবার জো নাই। সবাই নিজের গর্ব্বগৌরবে হাসে বকে নাচে; অকুণ্ঠিত তাহাদের

গতি, স্বাধীন তাহাদের ব্যবহার। তাহারা বসন্তর সম্মুখে রঙ্গ করে, মালা পরে, ফুল কাড়ে, তোড়া ছুড়িয়া লোফালুফি করে। প্রীত বসন্ত বিনিময়ে ফুলের অর্ঘ্য চরণে ঢালে, বীণার তারে গুঞ্জন তোলে, নূতন গাথায় তরুণীদের রূপের স্তুতি গাহে। আর যমুনা? যমুনা তখন লজ্জাভয়ের একান্ত সঙ্কোচে একটি ধারে চুপটি করিয়া আপনাকে গোপন করিতে চায়। কেহ কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়াও চায় না।

এত লজ্জা তাহার, এত অবহেলা তাহাকে, তবুও সে আসে। বসন্ত তাহার মালায় গানে, বীণায় গাথায়, কথায় হাসিতে, রূপে যৌবনে মিলাইয়া যে বিচিত্র রাগিণী তাহার চারিদিকে বাজাইয়া তুলিয়াছিল, তাহার অরূপ স্পর্শ এই রূপহীনার অন্তরেও এমন একটি মদির সুর ধ্বনিয়া তুলিয়াছিল যাহার মাদকতা গুরু লজ্জায় দারুণ অবহেলাতেও দমন করা যাইত না। সবাই হাসিতে গাহিতে খেলিতে আসে; যমুনা আসে শুধু অতৃপ্ত আঁখি ভরিয়া দেখিয়া লইতে। সবাই পাইতে আসে বসন্তর সেবা গান মালা স্তুতি; যমুনা দিতে আসে তাহার যমুনার মতো কালো সজল উজল চোখের স্বচ্ছ তরল দৃষ্টি ভরিয়া রূপহীনার রূপের পূজা, গুণহীনার গুণের প্রশংসা, বঞ্চিতার বিপুল বিস্ময়।

সবার সহিত সে একসুরে আপনার জীবনটিকে বাজাইয়া তুলিতে পারিতেছিল না বলিয়াই বৈষম্যে সে যা-একটু বসন্তর নজরে পড়িয়াছিল। নতুবা সেই রূপহীনা কুণ্ঠাকাতর মৌনমূক আগন্তুকটিকে দৃষ্টিতে তুলিবার অবসর বসন্তর ছিল না—তখ তাহার খর যৌবনের তপ্ত শোণিত রূপের নেশায় ভরপূর!

রূপহীনাকে রূপের হাট হইতে দূর করিবার যখন উপায় f...

না, তখন শুধু ভদ্রতার খাতিরে বসন্ত সেরা সুন্দরীদের সেরা সেরা মালা গাঁথিয়া শেষের যত বাছপড়া ঝরা ছেঁড়া বাসি ফুলে একগাছি মালা যেমন-তেমন গাঁথিয়া রাখিত;—রাজদ্বারে ভিখারীর হাতে ভিক্ষার মতন অবহেলা-ভরে সেই মালাগাছি যমুনার হাতে ফেলিয়া দিত। আর যমুনা? যমুনা সেই মালাগাছি দেবতার নির্ম্মাল্যের মতো শ্রদ্ধার সহিত মাথায় পরিত। যেদিন কুমারী ইন্দিরা একটু বিশেষ রকমের গ্রীবাভঙ্গি করিয়া সলীল কটাক্ষে হাসিয়া যাইত, কুমারী শুক্লা যেদিন যাইতে যাইতে একআধবার দয়া করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিত, কুমারী আনন্দিতা যেদিন মিষ্ট রকমের প্রাণমাতানো পরিহাস করিত, সেইদিন আনন্দোৎসবে মুক্তহস্ত দাতার মতো মালাকর বসন্ত যমুনার জন্যও বিশেষ করিয়া একগা।- মালা গাঁথিত নির্গুণ নির্গন্ধ কালো রঙের অপরাজিতা ফুলে। এদিন বসন্তর এই অপূর্ব্ব প্রসাদ পাইয়া যমুনার মন আনন্দ কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিত, এদিন তাহার লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিত না।

বসন্তর বাগানখানি ঘরের ফুলে ও বনের ফুলে শোভিত, চাঁদের জ্যোৎস্নায় ও রূপের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত, পাখীর কলকূজনে ও তরুণীর কলহাস্যকৌতুকে মুখর, ফোয়ারার অজস্র ধারায় ও হৃদয়ের অজস্র প্রীতিতে অভিষিক্ত, মণিদীপের আলোকে ও ডাগর চোখের পুলকে উজ্জ্বল। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, সকালের পর বিকাল, সন্ধ্যার পর প্রভাত, একটানা সুখস্রোতের মতো সময় ভাসিয়া যায়। তাহার মধ্যে একটি তরুণকে ঘিরিয়া তরুণীদের মেলা আনন্দে জমাট, উল্লাসে ফেনিল, প্রণয়ে মদির। বসন্ত কুসুমফুলের গাঢ় রঙে তরুণীদের শাড়ী ওড়না রঙাইয়া দিত, সন্ধ্যা-মণির হৃদয় পিষিয়া চরণ রঙাইত, হেনার পাতার রস গালিয়া হাত

রাঙাইত। আর, মধুর হাসি, প্রিয় বচন, চটুল চাহনি দিয়া হৃদয় রঙাইতে চেষ্টা করিত—রূপসীদের হৃদয় তাহাতে রঞ্জিত কি না কে জানে। কিন্তু তরুণীদের আফিমফুলের মতো রাঙা মাদক ঠোঁট দুখানি, ডালিমফুলের মতো গাল দুটি, শিউলিরঙা বসন আর মেহেদিরঙা চরণ নিজেদের সকল লালিমা জড়ো করিয়া বসন্তর তরুণ কোমল হৃদয়খানি শোণিতরঙে রঙাইয়া তুলিতেছিল। তরুণীরা বসন্তর যত অন্তরঙ্গ হইতেছিল বসন্ত আপনার অন্তরের মধ্যে তত শূন্য অনুভব করিতেছিল। সকল শূন্য পূর্ণ করিয়া একজন কাহাকেও আপনার জীবনে আবাহন করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রবল হইয়া উঠিতেছিল।

একদিন যখন সন্ধ্যাবেলায় গাছে গাছে ফুলের দেয়ালি সাজিতেছিল, যখন দক্ষিণা বাতাস বিরহমূর্চ্ছিতের নিশ্বাসের মতো থাকিয়া থাকিয়া ফুলের বনে শিহরণ হানিতেছিল, যখন ফুলের গন্ধে মাতাল হইয়া কোকিল পাপিয়া প্রলাপ বকিতেছিল, যখন হাজার দীপের শিখার মাঝে ফোয়ারার জল তরল হীরার মালার মতো গলিয়া পড়িতেছিল, যখন সান্দ্রনিবিড়-পল্লবচ্ছদ পথের উপর পরীরা সব হাল্কা হাতে চাঁদের আলোর আলপনা দিতেছিল, তখন বসন্তর বীণাসঙ্গতের প্রণয়সঙ্গীত বন্ধ করিয়া দিয়া লক্ষ্মীর মতো রাজকুমারী ইন্দিরা তাহার কুটীরদ্বারে আসিয়া উপনীত হইল।

বসন্ত তাড়াতাড়ি উঠিয়া ইন্দিরার পদপ্রান্তে তাহার ভরা সাজি উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া বলিল—ইন্দিরা, আমার বাহিরের ফুলই নিত্য তুমি লইয়া যাও, আমার অন্তরের অতুল ফুল তোমার চরণে কি স্থান পাইবে না? মিলন-উৎসবে ফুলের বন ফুল্লতর হইয়া উঠিবে না?

কুমারী ইন্দিরা ভ্রুকুটি করিয়া ঘৃণাভরে ফুলগুলি সব পদাঘাতে ছড়াইয়া দিয়া উদ্যত অশনির মতো বলিল—কী! এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার নীচ মালাকর! অনুগ্রহকে ভাব তুমি প্রণয়! রাজকন্যাকে কুটীরে বরণ করিবার সাধ তোমার! জানো তুমি, কর্ণাটরাজ স্বয়ং আমার উপযাচক পাণিপ্রার্থী! স্পর্দ্ধা তোমার ঘুচিবে, কাল যখন রাজাদেশে তুমি শূলে চড়িবে!

অবহেলার যে বেদনা বসন্তর বুকে লাগিল, সে বেদনা শূলাঘাতের অপেক্ষা অল্প নয়। এই ইন্দিরার শ্রীচরণে সে তাহার অন্তরভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠতম মহার্ঘ অর্ঘ্য দিনের পর দিন একে একে উজাড় করিয়া একেবারে রিক্ত হইয়া গিয়াছে, আজ তাহাকে নিঃস্ব করিয়া পদাঘাতে দূর করিল কিনা সেই!

বসন্ত ইন্দিরার পায়ে পড়িয়া বলিল—শূলে দিতে হয় দিয়ো। কিন্তু রাজকুমারী ভাবিয়া দেখ, বাহিরে দীন বলিয়া আমি অন্তরে দীন নই। বিশ্বজোড়া ঐশ্বর্য্য আমি তোমার পায়ে উজাড় করিয়া দিয়াছি—সে ঐশ্বর্য্য তুমি কোনো রাজার ভাণ্ডারে খুঁজিয়া পাইতে না। কাঙালকে সর্ব্বরকমে কাঙাল করিয়া মারিয়ো না।

ইন্দিরা হাসিয়া উঠিল। সেই উপহাস করাতের মতো করকর করিয়া বসন্তর অন্তর এপার ওপার চিরিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

তখন বসন্ত মিনতির স্বরে বলিল—আমার এতদিনের ব্যর্থ পূজার খাতিরে আমার একটি শেষ অনুরোধ রাখ। কাল প্রভাতের আগে একথা তুমি কাহারো কাছে প্রকাশ করিয়ো না। আমি একবার কুমারী শুক্লা আর আনন্দিতার কাছে ভাগ্য যাচাই করিয়া দেখিব।

ইন্দিরা দৃপ্তভাবে বলিল—বেশ, প্রার্থনা মঞ্জুর। আমিই

তাহাদের ডাকিয়া দিতেছি। তোমার এ যে দুরাশা—কোনো রাজকুমারী মালাকরকে মালা দিবে না, কালো কুৎসিত যমুনাও না,—সে মালাকর যতই কেন মোহন হোক না।

ইন্দিরা আসিয়া শুক্লাকে পাঠাইয়া দিল। শুক্লাও তেমনি রূঢ়ভাবে বসন্তর প্রণয়নিবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া আসিয়া আনন্দিতাকে পাঠাইল। আনন্দিতাও ব্যথিত মালাকরকে জ্বালাকর তাচ্ছীল্যে লাঞ্ছিত করিয়া ফিরিয়া আসিল। আনন্দিতা আসিয়া যমুনাকে হাসিয়া বলিল—ওলো যমুনা, যা লো যা, তোকে বসন্ত ডাকিতেছে।

বসন্ত ডাকিতেছে! তাহাকে! আনন্দে উল্লাসে লজ্জায় সঙ্কোচে আশায় আশঙ্কায় যমুনার হৃদয় ছাপাইয়া পড়িবার উপক্রম হইল। সে ভগিনীদের দিকে চাহিতে পারিল না, তাহাদের ক্রূর পরিহাস লক্ষ্য করিল না; সে তীর্থযাত্রী ভক্তের মতো পরম সম্ভ্রমে, প্রথম-মিলনভীতা নবোঢ়ার মতো কম্পিত হৃদয়ে কুণ্ঠিত চরণে লজ্জিত দীপে-চ ধীরে ধীরে গিয়া নির্ব্বাক নতনেত্রে বসন্তর সম্মুখে দাঁ-ইল! বসন্ত তখন ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতেছিল, যমুনার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

বসন্তকে ক্রন্দনে লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া যমুনার হৃদয় ফাটিয়া গিয়া শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল। না জানি তাহার নির্ম্মম ভগিনীরা ইহাকে কি দারুণ ব্যথাই দিয়া গিয়াছে। যমুনা তাহার ব্যথিত বন্ধুর দিকে সজল করুণ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে কম্পিত কণ্ঠে সান্ত্বনা ভরিয়া ভয়ে ভয়ে ডাকিল—বসন্ত!

বসন্ত উচ্ছ্বসিত গর্জ্জনে বলিয়া উঠিল—দূর হও দূর হও, ডাকিয়া আন জল্লাদকে, এখনি আমাকে শূলে দিক।

লজ্জিতা ব্যথিতা মিতবাক যমুনা সজল চক্ষে প্রাণভরা ব্যর্থ সান্ত্বনা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে সেথান হইতে চলিয়া গেল, তাহার কুণ্ঠিত প্রাণের উপর বসন্তর বেদনা লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। সে তাহার সকল শক্তির, সকল শান্তির, সকল শুভের, সকল সুখের বিনিময়ে বিশ্ব ছানিয়া বসন্তকে সান্ত্বনা দিতে পারিলে দিত। কিন্তু সে সকলের অনাদৃতা কুরূপা, সে আপনার অক্ষমতায় আপনি শুধু পীড়িত হইতে লাগিল।

রূপসী রাজকুমারীরা মুচকি হাসিয়া জিজ্ঞাসিল—ওলো যমুনা, মালাকর তোকে কি বলিল?

একথার উত্তর সে এই হৃদয়হীনাদের কি দিবে? সে নতমুখে শুধু বলিল—কিছু না।

সুন্দরীরা অট্টহাস্যে গাছে গাছে পাখীগুলিকে ভীত করিয়া বলিল—সৌখীন মালাকর! কালো কুৎসিত মনে ধরে না! যমুনা, তুই যে আমাদের বোন একথা মনে করিতেও লজ্জা হয়। সামান্য মালাকরও তোকে ঘৃণা করে। আমাদের ছায়ার মতন বেড়াইতে তোর লজ্জা করে না?

এ অপমান যমুনাকে স্পর্শ করিল না। ইহা তাহার প্রতিদিনের প্রাপ্য, ইহাই তাহার আভরণ। স্বয়ং বিধাতা যে তাহার বাদী! কিন্তু বসন্তর পরাভবে তাহার ভগিনীদের উল্লাস, বসন্তকে উপহাস, তাহাকে পীড়া দিবার পরামর্শ, যমুনার বুকে সহস্রসূচী-শস্ত্রের মতো বিঁধিতে লাগিল; সে ভগিনীদের বর্ব্বর আনন্দে মরিয়া যাইতে চাহিতেছিল; সে তাহার শোণিতাশ্রুসিক্ত হৃদয়খানি মেলিয়া বসন্তকে এই রূঢ় নিষ্ঠুরতা হইতে ঢাকিয়া রাখিতে পারিলে রাখিত। অক্ষমা সে!

পুষ্পবনের জ্যোৎস্নামাখা হাল্কা হাওয়া আজ যমুনার হৃদয়খাতের ভাবস্রোতে যে লহর তুলিয়াছিল তাহাও বড় দুঃখময়, বড় ক্লেশাতুর। আজ এই বাগানের জীবনস্বরূপ মালাকরের বেদনার চারিদিকে এত ফুলের হাসি, এত পাখীর কলগান, এত ভ্রমরের গুঞ্জন, এত জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি, এত হাওয়ার মাতামাতি বড় নিষ্ঠুর, বড় অসমঞ্জস বলিয়া মনে হইতেছিল। দুই হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিতে পারিলে সে ফেলিত, অন্ধকারের কালো পর্দ্দা টানিয়া দিয়া বাগানের এই নির্লজ্জ ব্যবহার ঢাকিতে পারিলে সে ঢাকিত। আজ যেন তাহার ভগিনীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া সারা বাগান বসন্তর বেদনায় আনন্দ করিতেছে। আর, তাহার লজ্জা বাণের মতো বাজিতেছিল গিয়া যমুনার বেদনাহত হৃদয়ে।

প্রভাতে রূপসী রাজকুমারীরা রাজার নিকট বসন্তর বেয়াদবি নিবেদন করিল। অনুরোধ করিল বেয়াদব বর্ব্বরটাকে শূলে দিতে হইবে, অনেকদিন রাজকুমারীরা শূলে হত্যার মজার দৃশ্য দেখিতে পান নাই।

রাজার আদেশে বসন্ত ধৃত হইয়া রাজসভায় নীত হইলে সে অকপটেই আপন অপরাধ স্বীকার করিল। সে মিথ্যা করিয়াও অস্বীকার করিলে রাজসভা সুখী হইত। কিন্তু না, বসন্ত মরিবেই, কিছুতেই সে অভিযোগ অস্বীকার করিল না। বর্ম্মাবৃত দ্বারীর চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। আহা এমন সুকুমার রূপ! এমন কোমল মধুর প্রকৃতি এই বসন্তর! এ-কে কিনা শূলে মরিতে হইবে!

কন্যাদিগকে রাজা অনুনয়ের স্বরে বলিলেন—ওটা পাগল! ওকে না হয় দূর করিয়া দি, আপদ চুকিয়া যাক।

রাজকুমারীরা অটল। সেবকের শোণিত দিয়া তাহারা চোখে

আনন্দের অঞ্জন টানিবেই টানিবে, পায়ে তাহার হৃদয় দলিয়া রক্তের অলক্তক তাহাদের পরিতেই হইবে।

শেষে রাজা অনেক কষ্টে রফা করিলেন বসন্ত যাবজ্জীবন বন্দী থাকুক।

বেশ! বন্দীই যদি থাকে তবে সে অন্তঃপুরের অন্ধ কারায় বন্দী থাকিবে; রাজকুমারীরা তাহাকে লইয়া একটু আনন্দ উল্লাসে সময় কাটাইবেন।

রাজা বলিলেন তথাস্তু।

অন্তঃপুরের দয়াময়ীদের রোষে যাহারা অভিশপ্ত তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য গঠিত এই অন্ধ কারা। পাষাণ প্রাচীর লৌহ-কপাটের দন্ত মেলিয়া একবার যাহাকে গ্রাস করে তাহাকে জীর্ণ না করিয়া উদ্গিরণ আর করে না। কপাট ইহার রন্ধ্রশূন্য, প্রাচীর ইহার নিরেট পুরু। কেবল বাতাস যাইবার জন্য মেঝে ও ছাদের কাছাকাছি দেয়ালে গুটিকয়েক ছিদ্র, আর বন্দীকে আহার দিবার জন্য এক দেয়ালে ছোট একটি ঘুলঘুলি। মরণকে বিলম্বিত করিবার এইসমস্ত ব্যবস্থা। আলো বাতাস খাদ্য যত পারে এই সব পথে যাইতে পারে, দয়াময়ীদের হুকুম আছে। কিন্তু হুকুম সত্ত্বেও আলো বাতাস অসঙ্কোচে ঢুকিতে পারে না, ঘুলঘুলির সামনে প্রকাণ্ড উঁচু ভারি পাথরের পুরু দেয়াল খাড়া; আর ঘুলঘুলিতে একটি বাটি খাবার ছাড়া অধিক দিবার উপায় নাই। এখানে যে একবার প্রবেশ করে মরিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করা ছাড়া তাহার আর অন্য উপায় নাই। ঘুলঘুলিটি এমন উঁচুতে, যে, বাহিরের লোক ভিতরে বা ভিতরের লোক বাহিরে উঁকি মারিতে পারে না, শুধু হাত গলাইয়া খাবার দিতে ও লইতে

পারে। প্রতিদিন আহারের পাত্র শূন্য হইয়া ঘুলঘুলির মুখের তাকের উপরে থাকে; যেদিন পাত্র শূন্য না হয় সেদিন বুঝা যায় বন্দী পীড়িত। একাদিক্রমে এক সপ্তাহ আহার অস্পৃষ্ট থাকিলে বুঝিতে হয় বন্দী ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইয়াছে।

বসন্ত এই ভীষণ কারাগারে বন্দী। ধরণীর সহিত অধিক দিন পরিচয় না হইতেই ধরার সহিত সকল সম্পর্ক তাহার ঘুচিয়া গেল। তাহার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার এই ধরিত্রী, তাহার আনন্দ-ভালোবাসার সকল সুন্দর মুখ, তাহার চন্দ্রসূর্য্য আলো ফুল বাতাস, সমস্ত, জন্মের মতো লোহার কপাটের কঠিন আড়ালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাহিরের হর্ষকোলাহল হয় তো তাহার কানে ভাসিয়া আসিবে, সে তাহাতে যোগ দিবে না।

কিন্তু বসন্ত নিজের নিষ্ফল প্রণয়ের হতাশ্বাসে এমন মগ্ন হইয়া গিয়াছিল যে তাহার এসব দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল না।

রূপসী রাজকুমারীরা আসিয়া রন্ধ্রপথে হাসিয়া হাসিয়া বসন্তকে বলিত—কিগো বর, বাসরঘরের আনন্দ আজ কেমন লাগিতেছে? আমরা তোমার বরমাল্য রচনা করিয়া আনিয়াছি, ওহে রসিক মালাকর, গ্রহণ কর গ্রহণ কর!

রাজকুমারীরা কাঁটার মালা বসন্তর কাছে ফেলিয়া দিয়া রূঢ় হাসি হাসিত। আর সেই কাঁটাগুলির চেয়েও তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর তাহাদের হাসি আর ব্যবহার তাহাদের পশ্চাৎবর্ত্তিনী যমুনার হৃদয়ে ফুটিয়া ফুটিয়া রক্তের অলকাতিলকায় তাহার হৃদয়খানিকে লজ্জিত ভীরু বধূর বেশে সাজাইয়া দিত।

কিন্তু রাজকুমারীদের এই রূঢ় ব্যবহার বসন্তকে অধিক পীড়া দিতে পারিত না—তাহাদের প্রথম ব্যবহারই এমন মর্ম্মন্তুদ

হইয়াছিল যে তাহার পর আর তাহার নূতন বেদনার অনুভূতি ছিল না।

বসন্ত অনেক অনুনয়ে আপনার বীণাটিকে কারাগারের সঙ্গী করিয়া লইয়াছিল। অন্ধকারে বসিয়া বসিয়া সে যখন একমাত্র অবশিষ্ট সুহৃৎটিকে আবেগভরে বুকে চাপিয়া তাহার তারে তারে প্রাণের বেদনা ব্যক্ত করিয়া তুলিত, তখন সমস্ত রাজপুরী বিষাদে যেন আচ্ছন্ন অশ্রুতে পরিম্লান হইয়া উঠিত। কেবল রূপসী রাজকুমারীরা হাসিয়া হাসিয়া রন্ধ্রপথে বসন্তকে বলিত—বাহবা বর, বাসরঘরে গান করিতেছ!

রাজকুমারীদের আনন্দ উৎসাহ দুদিনেই ক্লান্ত হইয়া পড়িল। বসন্তকে লইয়া একঘেয়ে আমোদ তাহাদের আর ভালো লাগে না, তাহারা নূতন আমোদের সন্ধানে কর্ণাট কলিঙ্গের রাজাদের দিকে মন দিল।

রাজকুমারীদের অন্তর্ধানে বসন্ত ক্রমশঃ নিজের অস্তিত্বের চারিদিকে সচেতন হইয়া উঠিতে লাগিল। সে দেখিল রাজকুমারীরা আর আসে না, কিন্তু তাহার খাবারের বাটিটি সকাল সন্ধ্যা নিত্য নিয়মিত ঘুলঘুলিতে হাজির হয়। যে তাহার আহার লইয়া আসে তাহার হাত দুখানি ক্ষুদ্র কোমল,—সে রমণী, এবং সে রমণী করুণাময়ী! বরাদ্দ তাহার একবাটি ছাতু। এই ছাতু যে আনিত সে আনিত ইহা গোলাপজলে দুগ্ধক্ষীরে মাখিয়া; ছাতুর তলায় চুরিকরা পায়সপিষ্টক ফলমিষ্টান্ন গোপন করিয়া; বাটিটিকে ফুল্ল ফুলের গন্ধবিধুর মালার পাকে বেড়িয়া। এই পাষাণহৃদয় রাজ-প্রাসাদেও কমলকোমল হৃদয় তবে এক-আধখানিও আছে! কে এই করুণাময়ী? কে এ?

এই সেবিকার প্রতি বসন্ত ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। বসন্ত পরম আগ্রহে রন্ধ্রপথের দিকে তাকাইয়া থাকে কখন সেই করুণাময়ী তাহার হাত দুখানি বাড়াইয়া বাটিটিকে ধরিবে। দেখিতে দেখিতে বসন্তর জানা হইয়া গিয়াছিল কখন সে আসে; যখন ঘরের অন্ধকার গাঢ়তায় বিশেষ একটি রকমে একটুখানি তরল হয়, যখন ঘুলঘুলির মুখে দেয়ালের ছায়া বিশেষ একটু ফিকে হয়, যখন ছাদের নীচের বিশেষ একটি রন্ধ্রের কাছে সূর্য্যালোকের তিলক পড়ে, তখন সেই করুণার আবির্ভাবের সময়। তখন ঘরের বাহিরের বাতাসের নিশ্বাস, টিকটিকির শব্দ, বিড়ালের সন্তর্পণ প্রস্থান বসন্তকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সচকিত করিয়া তুলে—তখন সে তাহার সমস্ত প্রাণের মনোযোগ কানে ও চোখে কেন্দ্রীভূত করিয়া বসিয়া থাকে। তারপর যখন সেই সেবিকা অন্নপূর্ণার মতো অঞ্জলিতে মমতা ভরিয়া ঘুলঘুলির পথে বাটিটি বাড়াইয়া ধরিয়া সান্ত্বনামধুর মৃদুকণ্ঠে তাহাকে ডাকে—বসন্ত, তখন বসন্ত উৎফুল্ল হইয়া এক লাফে নিকটে গিয়া দুই হাতে বাটি ধরে, কিন্তু তাহার অচেনা অদেখা প্রিয় বন্ধুর হাত হইতে বাটি লইতে বড়ই বেশি দেরি হয়।

সেই হাত দুখানিই তো বসন্তর সম্বল; বাহিরের প্রাণের, আনন্দের, সেবার, মমতার অতি ক্ষীণ নিদর্শন সেই অতিকোমল ছোট্ট দুখানি হাত! বসন্ত সমস্ত প্রাণ মেলিয়া চক্ষু ভরিয়া শুধু তাহাই দেখে। সেই হাত দুখানির বিশেষ আকার, আঙুলগুলির বিশেষ ভঙ্গি, নখগুলির বিশেষ গঠন, করতলের রেখাগুলির বিশেষ টানের বিচিত্র সমবায়, আর ডাহিন হাতের মণিবন্ধে কালো কুচকুচে ছোট্ট একটি তিল নিত্য নিত্য দেখিতে দেখিতে সেগুলি

বসন্তর অতিপ্রিয় বন্ধুর মতো সুপরিচিত হইয়া উঠিতেছিল। আঙুলে আঙুলে ঈষৎ স্পর্শেই বসন্তর বুকের মধ্যে রসপুলকের জোয়ার জাগিয়া স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিত ঐ আঙুলের অধিকারিণী তারুণ্যে বিমণ্ডিত, মমতায় সে ভরপুর, লজ্জায় সে সঙ্কুচিত! এই হাত দুখানি যে-শরীরকে অলঙ্কৃত করিয়াছে, অমন মনের মন্দির যে শরীর, অমন করুণার্দ্র কণ্ঠস্বর যে শরীরের, সে শরীর না জানি কত সুন্দর! কি দিব্য! কি অনিন্দ্য!

একদিন বসন্ত সেই হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—দেবী, আমার এই ঋণের বোঝা কাহার কাছে বাড়িয়া উঠিতেছে? কে তুমি চিরবন্দী আমাকে কঠিনতর বন্ধনে চিরবন্দী করিয়া তুলিতেছ? শুধু আমি ঋণীই হইব, শোধ দিবার ত উপায় নাই।

তরুণী স্নিগ্ধস্বরে বলিল—ভয় নাই মালাকর, তোমার ভয় নাই। যে তোমার কাছে অশেষ ভাবে ঋণী সেই তাহার কৃতজ্ঞতার এক কণা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

বসন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল—আমার কাছে ঋণী? তুমি কে?

তরুণী বলিল—আমায় তুমি সুভদ্রা বলিয়া জানিয়ো।

বসন্ত তাহাকে করুণস্বরে বলিল—ভদ্রে, তুমি কে আমি জানি না। কিন্তু তোমার দয়া দেখিয়া আমার আবার আলোকে নরলোকে ফিরিয়া যাইতে সাধ হইতেছে।

তরুণী কাতরকণ্ঠে সমবেদনা ভরিয়া বলিল—আমার প্রাণ দিয়াও তোমায় মুক্তি দিতে পারিলে দিতাম।

তরুণীর কথাগুলি অশ্রুতে ভিজা। বসন্ত তাহার আর্দ্র কম্পমান স্পর্শ অন্তরে অনুভব করিল। বসন্ত মুগ্ধ হইয়া বলিল—রাজকুমারীরা কি এই হতভাগার কথা ভাবেন না একবার?

—না বসন্ত, তাঁহাদের এমন তুচ্ছ ভাবনায় নিতান্ত সময়াভাব। কর্ণাট কলিঙ্গ মন্দ্রের রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করিবার জন্য ইন্দিরা শুক্লা আনন্দিতা ব্যস্ত।

—আর রাজকুমারী যমুনা?

—অক্ষমা কুৎসিতা কুণ্ঠিতা সে। বাহির তাহার বিধাতা ঢাকিয়াছেন, অন্তর তাহার সে নিজে ঢাকিয়াছে। তাহার ভাগ্য তো অত সহজ নয় বসন্ত! আর, যে বাড়ীতে একজন নিরপরাধ বন্দী পলে পলে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইতেছে, সে-বাড়ী ছাড়িয়া তো সে যাইতেও পারে না। তাহার ভগিনীদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে তাহাকে করিতে হইবে।

বসন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল—অ্যাঁ! যমুনা তাহা হইলে আমায় স্মরণ করে?

—স্মরণ করে বৈ কি বসন্ত, নিশিদিনই সে স্মরণ করে। তুমি তাহাকে এতদিন মালা দিয়া গান দিয়া প্রীতি দিয়া পরিতুষ্ট করিয়াছ, আর আজ সে তোমায় বিপদের মুখে ফেলিয়া যাইবে, এত বড় স্বার্থের যোগ্যতা তো তাহার কিছুই নাই।

বসন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল—আমি তো তাহাকে কোনো দিন আদর করিয়া কিছু দি নাই। তাহার ভগিনীদের উচ্ছিষ্ট, অবহেলা করিয়া তাহাকে দিয়াছি।

সুভদ্রা কণ্ঠস্বরে বিনয় ভরিয়া লইয়া বলিল—তাহাই সে সবহুমানে মাথা পাতিয়া লইয়াছে। সে তো জীবনে এত বেশি পায় না যে যাহা পায় তাহা আবার বাছিয়া বাছিয়া লইবে?

—সে যদি এমন তবে-সে আমার প্রণয়দান গ্রহণ করিল না কেন?

—হতভাগিনী সে। তাহাকে ত তুমি কিছুই বল নাই। শুধু তোমার বেদনায় ব্যথিত করিয়া তাহাকে অশ্রুজলে বিদায় করিয়া দিয়াছিলে।

বসন্তর মন সুখে দুঃখে বিমথিত হইয়া উঠিল। সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—তবে সে এখন একবার আমায় দেখিতে আসে না কেন?

সুভদ্রা তাহার স্বচ্ছ সুন্দর দৃষ্টিটি রন্ধ্রপথের দিকে ঊর্দ্ধ করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল—আসে, সে আসে। কুণ্ঠিতা লজ্জিতা অক্ষমা সে, আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না। আমি তাহারই ইচ্ছায় তোমার সেবা করিতেছি।

বসন্ত উৎফুল্ল হইয়া সুভদ্রার হাত দুখানি প্রাণপণ বলে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—ভদ্রে, তোমার কথা শুনিয়া আমার আবার বাঁচিতে সাধ হইতেছে। জগতের সকল নারীই ইন্দিরা শুক্লা আনন্দিতা নহে; তার মধ্যে যমুনা আছে, সুভদ্রা আছে। ভদ্রা, আমি যমুনাকে দেখিয়াছি, কিন্তু কখনো তাহাকে বুঝি নাই; আমি তোমাকে দেখি নাই, কিন্তু তোমায় যেন বুঝিয়াছি। যমুনার কুরূপ দেখিয়া অবহেলা করিয়াছি, ইহার লজ্জা আজ তাহার দয়ায় দারুণ হইয়া উঠিয়াছে—তাহাকে এই রূপলোলুপের অবিনয় ক্ষমা করিতে বলিয়ো। ভদ্রা, তুমি যদি আমায় গ্রহণ কর, তবে আমি বাঁচিতে পারি, এই অন্ধ কারা হইতে বাহির হইতে পারি।

সুভদ্রা বলিল—আমি যমুনার মতোই কুরূপ কুশ্রী।

বসন্ত উত্তেজিত স্বরে বলিল—হোক তোমার রূপ বিশ্রী কালো। এমন দুখানি বেদনাহরা হাত যাহার, এমন একখানি

সদয়করুণ হৃদয় যাহার, এমন মধুর বিনয়নম্র স্বর যাহার তাহার সৌন্দর্য্যের সীমা নাই, তাহার তুলনা জগতে নাই!

সুভদ্রা বলিল—তুমি তো আমার কোনো পরিচয়ই জিজ্ঞাসা কর নাই।

বসন্ত বলিল—আমি চাহি না কিছু পরিচয়। একবার বাহিরের পরিচয় খুঁজিতে গিয়া যমুনার কাছে অপরাধী হইয়াছি। তোমার অন্তরের পরিচয়ই যথেষ্ট; যথেষ্ট এই জানা যে তুমি সুভদ্রা, তুমি আমায় ভালো বাস, আমি তোমায় ভালো বাসি! এই চরম পরিচয়টি তুমি আমায় দাও। বল ভদ্রা, আমি যদি মুক্তি পাইয়া বাহির হইতে পারি তুমি কি রাজকুমারীর সঙ্গ, রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া আমার কুটীরে যাইতে পারিবে? একজন সামান্য মালাকরকে তুমি বরণ করিবে?

সুভদ্রার ভারি লজ্জা করিতে লাগিল কেমন করিয়া সে মুখ ফুটিয়া স্বীকার করিবে বসন্তকে সে প্রাণ ঢালিয়া ভালো বাসে। তাহার হৃদয়, ফাটিয়া পড়িয়া বলিতে চাহিতেছিল—ওগো বাসি বাসি তোমায় ভালোবাসি! আমি সকল কিছু তুচ্ছ করিয়া তোমার কুটীরে সুখে থাকিব। তোমায় সুখী করিতে পারাই আমার পরম সম্পদ, শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য, চরম আকাঙ্ক্ষা!—কিন্তু লজ্জা তাহাকে বলিতে দিতেছিল না। সে এতক্ষণ এত কথা বলিতে পারিতেছিল শুধু সে বসন্তর না-জানার আড়ালে ছিল বলিয়া,—বসন্তর কাছে সে যে একেবারে অপরিচিতা। কিন্তু সেই অপরিচিতা দৃষ্টির আড়ালে দাঁড়াইয়াও মুখ ফুটিয়া নিজের প্রণয় নিবেদন করিতে কিছুতেই যে পারিতেছিল না।

বসন্ত কোনো উত্তর না পাইয়া আবার বলিল—বল, ভ

বল। তোমার কথায় হতভাগ্যের সুখদুঃখ জীবনমরণের নির্ভর। তুমি কি এই সামান্য মালাকরকে গ্রহণ করিতে পারিবে?

সুভদ্রা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া অনেক কষ্টে মৃদুস্বরে বলিল—বসন্ত, তুমি সামান্য, আমিও ত অসামান্যা নই! তুমি যদি আমাকে কুরূপ কুশ্রী জানিয়াও গ্রহণ কর তবে তোমার পর্ণশালা আমার অট্টালিকা হইবে।

এই কথা কয়টি বলিয়া নিজের কাছে নিজের লজ্জায় সুভদ্রা যেন মরিয়া গেল।

বসন্ত তাহার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—বাঁচিব ভদ্রা, তোমার জন্যই আমি বাঁচিব।—আমায় একটু লিখিবার উপকরণ আনিয়া দিলে আমি বাঁচিবার উপায় করিতে পারি।

—রাত্রি হইলে আনিয়া দিব।—বলিয়া সুভদ্রা তাহার বন্দী বন্ধুর ব্যগ্র মুঠি শিথিল করিয়া হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

আজ অকস্মাৎ রাজপ্রাসাদ চমকিত করিয়া বন্দীর বীণায় আনন্দরাগিণী উচ্ছ্বসিত হইয়া বাজিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া বড় কান্নাটাই কাঁদিল যমুনা।

বসন্তর প্রাণ আজ প্রেমের প্রতিদানে আনন্দিত হইয়া গিয়াছে; প্রেয়সীর কোমলমদির স্পর্শখানি তাহার সমস্ত শরীর মন পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে। সে ব্যগ্রহৃদয়ে রাত্রির প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল সেই অন্ধকার ঘরের শক্ত লোহার কালো কঠিন বিরাট কপাট একেবারে খুলিয়া গেছে—সে সুভদ্রাকে লইয়া জ্যোৎস্নার আলোয় ফুলের বাগানে পুষ্পপাগল চাঁপার তলে বসিয়া সুভদ্রাকে ফুলে ফুলে সাজাইতেছে। আজ তাহাদের ফুলশয্যা!

অন্ধকার কারাগারের অন্ধকার ঘন করিয়া রাত আসিল। তারপর অকস্মাৎ ঘন অন্ধকার খুঁসি করিয়া দীপ্ত দীপের স্বর্ণরশ্মি কালো রেশমে জরি বুনিল। বাহির হইতে সুভদ্রা ধীরকণ্ঠে ডাকিল—বসন্ত !

বসন্ত পুলকোদ্বেলিত কণ্ঠে উত্তর দিল—ভদ্রা !

সুভদ্রা লেখার উপকরণ অগ্রসর করিয়া ধরিয়া বলিল—এই লও।

আনন্দিত বসন্ত অন্ধকারক্লিষ্ট আলোকভীত চক্ষু ঘুলঘুলি-পথের আলোর নীচে বিস্ফারিত করিয়া একখানি চিঠি লিখিল। তারপর বলিল—ভদ্রা, প্রতিজ্ঞা কর এই চিঠি তুমি বা যমুনা পড়িবে না, অপর কাহাকেও দেখাইবে না। দয়া করিয়া চিঠিখানি অবন্তীর রাজমন্ত্রীকে পাঠাইয়া দিতে পারিলেই আমি মুক্তি পাইব।

সুভদ্রা বলিল—তোমার শপথ, তোমার আদেশ পালন করিতে প্রাণপণ।

চিঠি লইয়া সেই রাত্রেই অবন্তীতে দূত গেল।

দূত গিয়া অবন্তী হইতে সংবাদ আসিবার সময় যত দিন লাগিতে পারে বসন্ত তাহা মনে মনে আন্দাজ করিয়া লইল। তাহার ছাদতলে রৌদ্রতিলকের ঘড়ীটি দেখিয়া দেখিয়া, সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া সে দিবারাত্রির অভেদ-আঁধার ঘরে বসিয়া দিন গণিতে লাগিল।

একদিন সুভদ্রা বলিল—বসন্ত, আজ অবন্তীর রাজমন্ত্রী সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত! কিন্তু তিনি তো তোমার উদ্ধারের [illegible] চেষ্টা করিতেছেন না।

বসন্ত হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তবে তিনি কোন উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন ?

—তিনি বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া আসিয়াছেন।

—কাহার ?

—রাজকুমারী যমুনার সহিত অবন্তীর সম্রাটসহোদরের, আর সম্রাটের সহিত ···

সুভদ্রা আর বলিতে পারিল না, লজ্জায় তাহার মুখের কথা ওষ্ঠে বাধিল।

সুভদ্রা লজ্জায় নীরব হইল দেখিয়া বসন্ত হাসিয়া বলিল—অবন্তীর রাজার সহিত বিবাহসম্বন্ধ কাহার ?

সুভদ্রা লজ্জারুণ হইয়া নতমুখে মৃদুস্বরে বলিল—এই পোড়ার-মুখী সুভদ্রার।

বসন্ত উৎসাহ দেখাইয়া বলিল—বেশ বেশ সুসংবাদ !

সুভদ্রা বসন্তের উৎসাহে ক্ষুণ্ণ হইয়া ব্যথিত স্বরে বলিল—সুসংবাদ নয় বসন্ত !

বসন্ত সবিস্ময়ে বলিল—সে কি ? অবন্তীর রাজা যে সার্ব্বভৌম রাজা !

সুভদ্রা দৃঢ়স্বরে বলিল—সার্ব্বভৌম হইতে পারেন, কিন্তু তিনি সার্ব্বমানস রাজা নহেন।

—তবে কি সম্রাটের প্রার্থনা ব্যর্থ হইয়া ফিরিবে ?

—ব্যর্থ তো এমনিও হইত। যমুনাকে দেখিলে সম্রাট-সহোদরের আগ্রহ থাকিত না ; আর সুভদ্রা এ বাড়ীতে এতই হীনা যে কেহই তাহাকে চেনে না, সম্রাটের পরোয়ানাও তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না। কিন্তু এ বাড়ীতে রাজ্যলোলুপ রাজকুমারীর

তো অভাব নাই। রূপসী রাজার-ঝিয়ারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়া গেছে তাহারা সম্রাটের প্রার্থনা ব্যর্থ হইতে দিবে না।

বসন্ত স্মিতপ্রফুল্ল মুখে বলিল—ভদ্রা, এইবার আমার মুক্তি নিকট। আজ এই শেষ আমাদের এই অদেখা অন্ধকারের মিলন। কাল সহস্র নারীর মধ্য হইতে শুধু যে হাতদুখানি দেখিয়া তোমায় আমি চিনিয়া চুনিয়া বাহির করিতে পারিব সেই হাতদুখানি আজ আমাকে আলোকে যাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া যাক।

সুভদ্রা তাহার সরমকম্পিত হাত দুখানি ঘুলঘুলি দিয়া বাড়াইয়া দিল। বসন্ত সেই লজ্জাহিম হাত দুখানি দুই হাতে চাপিয়া ধরিল, আকুল ওষ্ঠ তাহার অতদূর পৌঁছিল না।

পরদিন প্রত্যুষেই বসন্তর নিশ্চিন্ত নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাইয়া কারাগারের ভারি কবাট আর্ত্তনাদ করিয়া খুলিয়া গেল। কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন স্বয়ং কাশীরাজ; সঙ্গে তাঁহার অবন্তীর রাজমন্ত্রী।

কাশীরাজ বসন্তর চরণে পতিত হইয়া করজোড়ে বলিলেন—মহারাজ, অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

মন্ত্রী অভিবাদন করিয়া বলিলেন—মহারাজচক্রবর্ত্তীর জয় হোক।

বসন্ত রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া কারাগার হইতে বাহির হইল। স্নানশুচি হইয়া নির্ম্মল বেশবাস ধারণ করিল।

কাশীরাজ তাঁহার ভীত লজ্জিত কন্যাদের বসন্তর নিকট ডাকিয়া আনিলেন। তাহারা আসিয়া একে একে দূর হইতে সসম্ভ্রমে বসন্তকে প্রণাম করিয়া একপাশে নতমুখে দাঁড়াইল। সর্ব্বশেষে লজ্জায় জড়সড় হইয়া নিকটে গিয়া প্রণাম করিল যমুনা—তাহার

সগুস্নানে সিক্ত কেশকলাপ বসন্তর দুই পা ঢাকিয়া ছড়াইয়া পড়িল, কেশের মৃদু আর্দ্রতা বসন্তর চিত্ত দ্রব করিয়া তুলিল। বসন্ত তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রাণের গভীর প্রীতি ঢালিয়া নিজের অতীত আচরণ যেন মুছিয়া দিতে চাহিল।

কাশীরাজ বলিলেন—মহারাজ, অবোধ বালিকাদের অপরাধ আপনাকে ক্ষমা করিতে হইবে।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—আমি উহাঁদিগকে ক্ষমা করিয়াছি আপনার এই উপেক্ষিতা কন্যাটির গুণে। ইহাঁর কাছে আমার ক্ষমা চাহিবার আছে।

এই বলিয়া বসন্ত অন্য রাজকুমারীদিগকে লক্ষ্য না করিয়া যমুনাকে বলিল—যমুনা, আমার অতীত অবিনয় মার্জ্জনা কর।

যমুনা নতমুখে নখ খুঁটিতে লাগিল। তাহার গর্ব্বিতা ভগিনী-দের সম্মুখে, স্নেহহীন পিতার সমক্ষে তাহার এ কি লাঞ্ছনা! কি লজ্জা!

বসন্ত সকলের সহিত কথা কহিতেছিল কিন্তু তাহার চক্ষু দুটি ব্যাকুল হইয়া অন্তঃপুরের চতুর্দ্দিকে প্রত্যেক কপাটের অন্তরাল জনতার অভ্যন্তর খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, কোথায় তাহার সুভদ্রা, কোথায় তাহার দয়িতা, কোথায় তাহার প্রেয়সী! সে তো তাহার মুখ চিনে না! চিনে তাহার হাত, চিনে তাহার কণ্ঠস্বর, চিনে তাহার সদয় হৃদয়!

কথার উত্তর না পাইয়া বসন্তর চক্ষু যমুনার দিকে ফিরিয়া আসিল। সে দেখিয়া চমকিত হইল যমুনার হাতদুখানিই সেই তাহার অন্ধকারের সান্ত্বনা সুভদ্রার হাত! সেই তাহার দুঃখ-দিনের অতিপরিচিত আঙুলগুলি, নখগুলি, রেখাগুলি, আর

সেই মণিবন্ধের অতিসুন্দর তিলটি যেন তাহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছিল এই সেই, এই সেই, এই সেই!

বসন্তর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্তে প্রণয়কৃতজ্ঞতার মোহন স্পর্শে যমুনা বসন্তর চক্ষে অতুলনা রূপসী হইয়া দেখা দিল। একটি অতিসুন্দর চিরকিশোর অশরীরী দেবতার বরে বসন্তর দৃষ্টিতে যে প্রেমের অঞ্জন লাগিয়া গেল, তাহার ভিতর দিয়া সে দেখিল যমুনা অতুলন রূপে যৌবনে আনন্দে কল্যাণে মাধুর্য্যে সৌন্দর্য্যে ঝলমল করিতেছে! বসন্ত তখন কাশীরাজের দিকে ফিরিয়া বলিল— রাজন্, আপনার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে।

—ভিক্ষা কি মহারাজ! অপরাধীর অপরাধ বাড়াইবেন না। আদেশ করুন।

—আপনার দণ্ডস্বরূপ আপনার ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্নটি আমি লইব।

—সে তো আপনার অনুগ্রহ, আমার সৌভাগ্য। কোষাধ্যক্ষ আপনার আদেশের অপেক্ষা করিতেছে।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—আমি যে রত্নের কথা বলিতেছি, সে রত্ন আপনার কোষাধ্যক্ষ চেনেন না। সেটি আমি অনেক কষ্টে আবিষ্কার করিয়াছি, সেটি এই।

এই বলিয়া বসন্ত অগ্রসর হইয়া দুই হাতে যমুনার হাতদুখানি চাপিয়া ধরিল। সকল লোকের বিস্মিত অবিশ্বাস অগ্রাহ্য করিয়া বসন্ত যমুনাকে হাসিয়া বলিল—ভদ্রা, যমুনা, রাজচক্রবর্ত্তীর সহিত প্রবঞ্চনা! এর শাস্তি তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে—কাশী হইতে অবন্তীর রাজপ্রাসাদে তোমার নির্ব্বাসন! কেমন, এ দণ্ড

স্বীকার করিলে তো? আজ আর বোধহয় অবন্তীর প্রার্থনা ব্যর্থ করিয়া ফিরাইতে পারিবে না। অবন্তীর রাজপ্রাসাদ যদি ভালো না লাগে, অবন্তীতে ফুলের বনের অভাব নাই, অবন্তীর মহারাজ সেইখানেই তোমার বসন্ত মালাকরকে ধরিয়া রাখিবে! তাহার বীণা তোমার বন্দনা আনন্দে গাহিবে! নিত্যই সে তোমার গলায় অম্লান পুষ্পের মালা পরাইবে! তুমি ছুটি না দিলে ছুটি সে পাইবে না!

যমুনা লজ্জায় সুখে গলিয়া পড়িবার মতো হইয়া কোনো মতে দাঁড়াইয়া রহিল।

কাশীরাজ অবিশ্বাস্য ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া বলিলেন—মহারাজ, আমার এইসমস্ত সুন্দরী কন্যারা এখনো অবিবাহিতা।

বসন্ত হাসিয়া রূপসীদের লজ্জায় মাটি করিয়া দিয়া বলিল—না রাজন্, উহাঁরা কর্ণাট কলিঙ্গ উজ্জ্বল করিবেন শুনিয়াছি।

—কিন্তু মহারাজ, আপনার শ্রীচরণে স্থান পাইলে উহারা আনন্দে কর্ণাট কলিঙ্গ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—রূপের নেশা আমার কাটিয়াছে। রাজার প্রাসাদে হৃদয় কিনিতে পাওয়া যায়, জয় করিয়া পাওয়া যায় না। তাহা জানিয়াই এই দীনবেশে হৃদয়জয়ে বাহির হইয়াছিলাম। একটি হৃদয় আমি পাইয়াছি যাহা হৃদয় চায় রাজ্য চায় না। জয় করিতে আসিয়া বড় আনন্দে হারিয়া গেলাম। আমার এই কালো বধূটিই আমার রাজ্য উজ্জ্বল করিবে। আমি বুঝিতে পারি নাই যমুনার হৃদয় গভীর শীতল বলিয়া তাহার রূপ কালো! যামিনী কালো বলিয়াই তাহার বুকে অযুত জ্যোতিষ্কের মালা দোলে! কালো কয়লার হৃদয় আলো করিয়াই সূর্য্যের কণা

দীপ্ত হীরক লুকানো থাকে ! যমুনা, আমি অবহেলা করিয়া তোমায় অপরাজিতার মালা দিতাম, দুঃখে পড়িয়া সুখে জানিলাম তুমি বাস্তবিকই অপরাজিতা ! তুমি অতুলনা !

চটির পার্টি

আমি পশ্চিমে চাকরি করি। বড়দিনের ছুটির আগে কয়েক-দিনের ছুটি লইয়া আমি বাড়ী আসিতেছিলাম। ট্রেনে দেখিলাম বিষম ভিড়। দিল্লীর দরবার তখন সদ্য সমাপ্ত হইয়াছে, এবং কলিকাতায় রাজসমাগম, কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স প্রভৃতি আসন্ন হইয়া আসিয়াছে ; শীতকালে কলিকাতায় আমোদ আহ্লাদ রঙ্গ তামাসারও আয়োজন থাকে প্রচুর—এবারে বিশেষ ভাবে গণ্ডা দেড়েক সার্কাস, দুদল সেক্সপীয়র অভিনেতা, চার-চারটে বায়ো-স্কোপ প্রভৃতি, দীপ্ত দীপের ধারে পতঙ্গের মতো, দর্শক আকর্ষণ করিতেছিল বিস্তর। অধিকন্তু এই সময়ে রেল কোম্পানী এক-বারের পারাণি কড়ি লইয়া ডবল খেয়া পার করে বলিয়া দরকার না থাকিলেও অনেকে এক পাক ঘুরিয়া আসার প্রলোভন সাম-লাইতে পারে না। সুতরাং ভিড়েরও অবধি থাকে না। ট্রেনে বগি গাড়ী দিয়া কুলাইতে না পারিয়া রেল কোম্পানীর সেকেলে বকেয়া সম্পত্তি সরু-সরু-কামরা-ভাগ-করা গাড়ী জুড়িয়াও লোকের স্থান করা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল।

আমি অনেক কষ্টে একখানি শিকঘেরা সরু কামরার মধ্যে উঠিয়া কোনো মতে একটু স্থান করিয়া লইয়াছিলাম। সে

কামরায় একজন পাঞ্জাবী বড় বড় বিছানার মোট ও বাক্স তোরঙ্গ ঝুড়ি প্রভৃতিতে উপরের বাঙ্ক দুটি বোঝাই করিয়া বসিয়া ছিল— তাহার যেমন দেহ, তেমন দাড়ি এবং তেমনি কি পাগড়ীর আয়তন! নীচের বেঞ্চিতে পাঁচজন পেশোয়ারী তাহাদের বিপুলায়তন শরীর, ঢিলাঢালা পোষাক ও শীতবস্ত্রের মোট লইয়া বিরাজমান। অপর সাত জনের মধ্যে তিন জন বাঙালী চার জন হিন্দুস্থানী। এই তের জনের উপর আমি হইলাম চতুর্দ্দশ। সুতরাং আমি যখন এই কামরায় প্রবেশের দুশ্চেষ্টা করিতেছিলাম, তখন পাঞ্জাবীর গর্জ্জন, পেশোয়ারীর আস্ফালন, হিন্দুস্থানীর বক-বকানি ও বাঙালীর দাঁতখিঁচুনি যে কিরূপ ভীষণ প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিয়াছিল তাহা বলিয়া বুঝানো শক্ত।

আমি কাহাকেও কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া যখন গাড়ীতে চড়িতে আসিলাম তখন দুইজন পেশোয়ারী দুই দিক হইতে গাড়ীর কপাট টানিয়া ধরিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। আমি তৎ-ক্ষণাৎ রণে ভঙ্গ দিবার ভাণ করিয়া সেখান হইতে একটু সরিয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম, লক্ষ্যটা যেন আশে-পাশের কামরার প্রতিই। তখন আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া পেশোয়ারীরা সরিয়া বসিল আর তৎক্ষণাৎ আমিও দরজার হাতল ঘুরাইয়া একেবারে গাড়ীর ভিতরে উঠিয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম।

আমার আকস্মিক আবির্ভাবে আরোহীরা একবার কোলাহল করিয়া উঠিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল। সুতরাং শীঘ্রই সন্ধি হইয়া গেল। আমি গাড়ীর দরজার কাছেই এক পেশোয়ারীর পাশে স্থান পাইলাম।

এতক্ষণ যে গাড়ীর দরজা ধরিয়া উভয় পক্ষে গজকচ্ছপের যুদ্ধ চলিতেছিল তাহা যেন মিথ্যা, স্বপ্ন মাত্র—বাস্তবিক পক্ষে আমরা পরম মিত্র, এমনি ভাবে সকলের সঙ্গে আলাপ জমিয়া উঠিল। আমাদের যাত্রীদের মধ্যে প্রায় সকলেই কলিকাতায় যাইবে; কেবল হিন্দুস্থানীরা নামিবে পাটনায় এবং পাঞ্জাবী নামিবে আসান-সোলে।

গাড়ী নির্বিবাদে মোগলসরাই ষ্টেসনে আসিয়া পৌছিল। একটি ব্রাহ্মণপণ্ডিত ধরণের লোক চাদরের উপর একখানি লাল বনাত গায়ে দিয়া, একটি ভারি পুঁটুলি বগলে লইয়া, প্লাটফর্ম্মে ছুটাছুটি করিতেছিল। ব্রাহ্মণ যেখানে যায় সেখান হইতেই বিতাড়িত হইয়া ফিরিয়া আসে। সময় যতই যায় ব্রাহ্মণও ততই ব্যস্ত হইয়া কলের-তাঁতের মাকুর মতন, দক্ষ খেলোয়াড়ের ব্যাটের মুখে লন্‌টেনিসের বলের মতন কেবলই এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে থাকে, কোথাও বেচারা একটু স্থিতি পাইতেছে না। অবশেষে ব্রাহ্মণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমাদের কামরার সম্মুখে আসিয়া অতি মিনতির স্বরে বলিল—বাবা, একটু দরজাটা খুলে দাও বাবা।

আমি বলিলাম—ঠাকুর মশায়, দেখছেন আমরা চোদ্দ জন আছি; আর দেখছেন ত চোদ্দ জন নয় চোদ্দ জোয়ান! আপনি অন্যত্র চেষ্টা দেখুন।

ব্রাহ্মণ নেড়া মাথায় টিকি নাড়িয়া বলিল—সব শালার খোসামোদ করে এসেছি বাবা, কোনো বেটার যদি ব্রাহ্মণ বলে একটু ভক্তিশ্রদ্ধা হল। ঘোর কলি! ঘোর কলি! খুলে দাও বাবা!

আমি হাসিয়া বলিলাম—ঠাকুর মশায়, এ কামরার আরোহী-দেরও যে ব্রাহ্মণের প্রতি খুব বেশি রকম ভক্তিশ্রদ্ধা আছে এরূপ সন্দেহ আপনি কেন করছেন? এই যে পেশোয়ারী ক'টি এরা গোব্রাহ্মণহিতায় চ মোটেই নয়।

—তোমরা ত বাবা বাঙালী হিঁদু, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপকারটি কর বাবা ...

একজন পেশোয়ারী ব্রাহ্মণের বোচকায় ধাক্কা দিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে বলিল—ভাগো ভাগো, ইহাঁ পর জাগা কাঁহা!

ব্রাহ্মণ বোচকার ভারে টলিয়া পড়িয়া গেল। এবং ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল।

আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া নামিয়া একহাতে ব্রাহ্মণের বোচকা ও অপর হাতে ব্রাহ্মণকে ধরিয়া টানিয়া গাড়ীতে তুলিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

পেশোয়ারীরা রুষ্ট হইয়া আমাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণ আমার মাথার টেড়িটিকে নাস্তানাবুদ করিয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল, আমি হাসিমুখে উভয় পক্ষেরই অত্যাচার গ্রহণ করিলাম।

আমার জায়গাটিতে আমি ব্রাহ্মণকে বসাইয়া নিজে দাঁড়াইয়া রহিলাম। পেশোয়ারীরা কি জানি কেন আমার উপর ভারি খুসি হইয়া গিয়াছিল—তাহারা আমাকে তাহাদের কাপড়ের মোটের উপর বসিতে বলিল।

ইহার পর হইতে আমাদের কাহাকেও আর লোক তাড়াইবার কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। সে ভার লইয়াছিল সেই ঠাকুর মশায়। পশ্চিমে তীর্থ করিতে আসিয়া তাহার মেজাজটা এমনি

রোখালো হইয়া গিয়াছিল যে হিন্দি ছাড়া সে আর কিছু বলিতে পারিতেছিল না ; তাহার হিন্দি নাগরীপ্রচারিণী সভাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া নির্ভীক নিরঙ্কুশভাবেই নির্গত হইতেছিল। কেহ গাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলেই ঠাকুর চীৎকার করিতেছিল—জায়গা নেই হায়, জায়গা নেই হায়! দেখতা নেই পঁনর আদমি হায়? আর কাঁহা বৈঠেগা? গা পর বৈঠেগা না মাথা পর বৈঠেগা?

আমি হাসিয়া বলিলাম—ঠাকুর মশায়, আপনি ত এইমাত্র গাড়ীতে ওঠবার জন্যে আকুলি বিকুলি করছিলেন ; এখন গাড়ীতে উঠে সে কথাটা ভুলে গেলে চলবে কেন যে সকল যাত্রীরই গরজ সমান।

ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া নাকে খুব বড় এক টিপ নস্য ভরিয়া বলিল—গরজ সমান হলে কি হয়, বসবে কোথা, জায়গা কৈ?

আমি হাসিয়া বলিলাম—আপনি যখন উঠেছিলেন তখনও ত জায়গা ছিল না।

—আরে তার চেয়ে ত এখন আরো কমে গেছে।

—হ্যাঁ, কিন্তু সে বিচার আপনার আমার করা শোভা পায় না, কারণ আমরা ভরা গাড়ীতে উঠেছি। বিচারের ভার থাকা উচিত আগন্তুক আরোহীর ওপর। তাঁরা যদি এত লোক দেখেও ওঠেন তবে বুঝতে হবে অন্যত্রও এই রকম অবস্থা।

ঠাকুর টিকি নাড়িয়া বলিল—হাঁঃ! তুমি তো বললে এই রকম অবস্থা। কিন্তু এর ওপর লোক-বৃদ্ধি হলে আমাদের অবস্থাটা কি রকম হবে?

আমি নীরব হইয়া হাসিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণ খুব ঘন ঘন নস্য লইতে লাগিল। শেষে বলিল—কাশীর নস্য অতি উত্তম! নেবে?

—আজ্ঞে না—বলিয়া আমি ব্রাহ্মণের রকম দেখিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া গাড়ীসুদ্ধ সকলেই স্মিতমুখে কৌতুক অনুভব করিতেছিল।

গাড়ী বক্সারে পৌঁছিলে একজন বাঙালী ভদ্রলোক একটা তোরঙ্গ ও একমোট বিছানা লইয়া আমাদের গাড়ী আক্রমণ করিলেন। ব্রাহ্মণ ত টিকি নাড়িয়া একেবারে মারমুখো। আমি আগন্তুককে বলিলাম—আমরা এখানে পনরজন আছি। অন্য গাড়ীতে আপনি চেষ্টা দেখলে ভালো হত।

—সব গাড়ীতেই এই রকম মশায়। আমি বেশি দূর যাব না, আমি মোকামাতে নেমে যাব।

—আচ্ছা আসুন।—বলিয়া আমি দরজা খুলিয়া ধরিলাম।

ব্রাহ্মণ দরজা ধরিয়া বন্ধ করিবার জন্য টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি জোর করিয়া খুলিয়া রাখিয়া হাসিতে হাসিতে ব্রাহ্মণকে বলিলাম—ঠাকুরমশায় মোগলসরাইয়ে নিজের অবস্থাটা স্মরণ করুন।

ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—তুমি ত বড় পাজি লোক হে! আমায় গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়েছ তো একেবারে মাথা কিনেছ আর কি? এ গাড়ী কি তোমার কেনা? কোম্পানীর গাড়ী! আমি পয়সা দিয়ে চড়েছি! তবে অত কথা কও কেন হা?

আমি হাসিয়া বলিলাম—এ ভদ্রলোকও কোম্পানীকে পয়সা দিয়ে এসেছেন, অমনি আসেন নি আপনার দয়া ভিক্ষে করতে।

ব্রাহ্মণ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—তুমি তো বড় বেল্লিক হে। যত লোক পয়সা দিয়েছে সব লোক এক গাড়ীতে আসবে নাকি?

আমি পূর্ব্ববৎ হাসিয়াই বলিলাম—আজ্ঞে, সেটা আমার একটু ভুল হয়ে গেছে। এক গাড়ীতে যে সকলের ঠাঁই হয় না সে বোধটা মোগলসরাইয়ে হলেই ঠিক হত।

ব্রাহ্মণ পরাস্ত হইয়া রাগিয়া গনগন করিতে লাগিল। আমার উপর ব্রাহ্মণের ক্রোধ দেখিয়া আর কেহই আমাকে কিছু বলিল না। কেবল একজন পেশোয়ারী হাসিয়া বলিল—বাবু, তুমি সবাইকেই যে নিমন্ত্রণ করে এই কামরাতেই ভরছ।

আমি হাসিয়া বলিলাম—কি করি বল মিঞা সাহেব, সকলের যেতে হবে ত? আর, পাটনায় এই কজন নেবে যাবে; এ ভদ্রলোক মোকামায় নাববেন; তখন খুব জায়গা হয়ে যাবে, তখন আমাদেরই রাজত্ব হবে।

ব্রাহ্মণ বলিল—হাঁঃ, তুমি সেই ধাতের লোক কিনা; বিশ্ব বাংলার সকল লোককে ডেকে এই গাড়ীতে তুলবে তখন।

চরম লোক-বোঝাই হওয়াতে আর কোনো ষ্টেশনে কেহ আমাদের কামরার প্রতি দৃক্‌পাতও করিল না। এখন নামিবার পালা।

পাটনায় হিন্দুস্থানীরা নামিবার জন্য উঠিল। ব্রাহ্মণ হুঙ্কার করিয়া বলিল—এই, আভি নামতা কাহে, আভি কেত্তা লোক উঠেগা। বৈঠো বৈঠো।

আমি হাসিয়া বলিলাম—ঠাকুর মশায়, আপনার অনুরোধে কি ওরা গন্তব্য স্থান ছেড়ে আপনার বাড়ী পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে পৌঁছে দেবার জন্যে স্থির হয়ে বসে থাকবে?

ব্রাহ্মণ বলিল—তুমি তো বড় ব্যস্তবাগীশ হে! লোককে তোলবার জন্যেও যেমন তাড়াতাড়ি নামাবার জন্যেও তেমনি!

আমি হাসিয়া বলিলাম—একটু ব্যস্তবাগীশ না হলে যে ঠাকুরমশায়কে এখনো মোগলসরাইয়ের কাঁকরের ওপর গড়াগড়ি দিতে হ'ত।

হিন্দুস্থানীরা তাহাদের পোটলা পাঁটলি, লেপ লোটা, লাঠি সোঁটা, নাগরা জুতা প্রভৃতি ঘাড়ে পিঠে হাতে ঝুলাইয়া লইয়া একে একে নামিতে লাগিল; কাহারো লোটা ভট্টাচার্য্যের নেড়া মাথায় ঠক ঠক করিয়া ঠুকিয়া গেল, কাহারো নাগরা জুতার নাল ব্রাহ্মণের দীর্ঘ নাসিকায় ঘসিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বসিয়া বসিয়া—উল্লুক! ছাতুখোর কাঁহাকা! এই সামালকে নামো! —ইত্যাদি বলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল।

মোকামায় শেষাগত বাঙালীটি তাঁহার বাক্স বিছানা লইয়া নামিয়া গেলেন। বাক্সের কোণ লাগিয়া ভট্টাচার্য্যের পুঁটলিটি বেঞ্চি হইতে নীচে গড়াইয়া পড়িল এবং বোচকাবাঁধা কাপড়খানা একটু ছিঁড়িয়া গেল। আর যায় কোথায়! ব্রাহ্মণ সপ্তমে চড়িয়া গালাগালি আরম্ভ করিল। রাগের শেষ তালটা আসিয়া পড়িল আমার ঘাড়ে।—"তোমার জন্যেই ত আমার কাপড় ছিঁড়ল। এর ভেতরে বাবা বিশ্বেশ্বরের ফুল বেলপাত আছে, এতে যে পা ঠেকল তাতে কি তোমার ভালো হবে? উচ্ছন্ন যাবে, উচ্ছন্ন যাবে।"—বলিয়া ব্রাহ্মণ ঘন ঘন হাত ও টিকি আন্দোলন করিতে লাগিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম—ঠাকুরমশায়, কোনটা ফলবে—গাড়ীতে ওঠার আশীর্ব্বাদটা, না এই অভিসম্পাতটা?

একজন বাঙালী সহযাত্রী দূরের কোণ হইতে বলিল—কোনোটাই ফলবে না; দুটোতে কাটাকাটি হয়ে যাবে!

ব্রাহ্মণ আস্ফালন করিয়া বলিতে লাগিল—ফলবে না? ফলবে না? সাক্ষাৎ বাবা বিশ্বেশ্বরের টাটকা ফুল বেলপাতের অপমান! উচ্ছন্ন যাবে! উচ্ছন্ন যাবে!

আমি গম্ভীরভাবে জোড়হাত করিয়া বলিলাম—ঠাকুরমশায়, আপনার ঠিকানাটা দিয়ে যাবেন; আমি উচ্ছন্ন গেলে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণটা আপনার কেন ফস্কাবে; আপনি অনুগ্রহ করে আমার শ্রাদ্ধের দিন পায়ের ধূলো দিলে আমি পরলোকে গিয়ে কৃতার্থ হব।

গাড়ীর সকল বাঙালী আরোহীরা উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল। তাহাদের হাসি দেখিয়া পাঞ্জাবী পেশোয়ারী সকলেই হাসিল। হাসির সংক্রামকতা ক্রমশ শিকের ফাঁকে ফাঁকে কামরা হইতে কামরান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। তখন সকল কামরার আরোহীর নজর পড়িল সেই ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের দিকে।

ব্রাহ্মণ আমাকে রাগাইতে না পারিয়া এবং সকলের কৌতুক-পাত্র হইয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া নস্য লইতে মনঃসংযোগ করিল।

এখন হইতে যেই গাড়ী ষ্টেসনে থামে আর অমনি ব্রাহ্মণ মুখ বিকৃত করিয়া আমায় বলে—ডাক ডাক, সবাইকে ডাক, অনেক জায়গা রয়েছে, ডাক।

অন্যান্য কামরাও প্রায় খালি হইয়া আসিয়াছিল সুতরাং আমাদের কামরায় মধ্যে মধ্যে অল্পদূরের যাত্রী দু একজন ছাড়া আর বড় বেশি কেহ উঠিল না।

এইবার পাঞ্জাবীপ্রবরের নামিবার পালা। তাহার সেই বিপুলায়তন দেহ ও পাগড়ী লইয়া সে ক্রমে ক্রমে তাহার অতিকায় বাক্স পেঁটরা মোটমাটরি নামাইতে লাগিল। মোটা মোটা মোট

বাক্সগুলি কি সহজে দরজা দিয়া ফাঁশে? অনেক টানাটানি অনেক ঠেলাঠেলি করিয়া এক একটি পার হইতে লাগিল। আমি দরজার মুখের কাছে ছিলাম; সুতরাং আমিই ধরিয়া ধরিয়া মোটগুলি বাহির করিয়া দিতেছিলাম। ব্রাহ্মণও দরজার কাছেই ছিল। কিন্তু সে হাত পা গুটাইয়া বেঞ্চির উপর জগন্নাথের মতন বসিয়া অনবরত বকিয়া যাইতেছিল—যত সব হতভাগা লক্ষীছাড়া এসে জুটেছে। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসবার জো নেই। আর এই এক ফুক্কুরদালাল জুটেছে, সকল তাতেই আছে। কার মোট নামল না নামল তোর অত মাথাব্যথা কেনরে বাপু।

পাঞ্জাবীর সমস্ত মোট নামাইবার পূর্ব্বেই গাড়ী ছাড়িবায় ঘণ্টা দিল। তাড়াহুড়া করিয়া সব মোট নামাইয়া পাঞ্জাবী যখন গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল তখন গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম।

এতক্ষণে ব্রাহ্মণ পা নামাইয়া সোজা হইয়া বসিল। পা নামাইয়াই বেঞ্চির তলে পা চালাইয়া কিছুক্ষণ সে ইতঃস্তত পদ-চালনা করিল। তারপর ঝুঁকিয়া সে কি খুঁজিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ঠাকুরমশায় কি খুঁজছেন?

ব্রাহ্মণ এক পায়ে চটি পরিয়া অপর নগ্নপদ উর্দ্ধে উঠাইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিল—আমার আর একপাটি চটি?

বেঞ্চির তল, মোটের নীচে, আশপাশ সর্ব্বত্র খুঁজিলাম কোথাও চটির পাটি মিলিল না। বুঝিলাম পাঞ্জাবীর মাল টানাটানি করিবার সময় চটির পাটি পরিপাটী চম্পট দিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ঠাকুরমশায়, আপনার চটির দু পাটিই ছিল ত?

ব্রাহ্মণ তো তেলেবেগুনে জ্বলিয়া আমার উপরে খাপ্পা হইয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিল—না, দুপাটি থাকবে কেন ? আমি এক পায়ে চটি পরে বেড়াই ? আমি কি একানড়ে ভূত ? বেল্লিক আহাম্মক কোথাকার !

আমি হাসিয়া বলিলাম—না না, আমি সে কথা বলছিনে যে আপনি এক পায়ে চটি দিয়ে বেড়ান। তবে এমনও তো হতে পারে যে তীর্থে লোকে এক একটা বস্তু ত্যাগ করে আসে, আপনি এক পাটি চটি ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় পাণ্ডা গুণ্ডার পীড়াপীড়িতে ত্যাগ করে এসেছেন।

ব্রাহ্মণ টিকি উৎক্ষিপ্ত করিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিয়া উঠিল —কী ! খৃষ্টান, অধার্ম্মিক, বেল্লিক। তীর্থের অপমান ! ... আমি যদি ব্রাহ্মণ হই, যদি আমি ত্রিসন্ধ্যা করি ...

আমি তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলাম—তবে তুমি গোল্লায় যাও ! কিন্তু ঠাকুরমশায়, গোল্লায় যাওয়াটা কেমন তা জানা নেই, গোল্লা খেতে কিন্তু ভারি মুখ-রোচক। আর, কলিকালে ব্রাহ্মণের শাপে কেউ মরে না, ব্রাহ্মণের লাঠিতে সাপ থেকে মানুষ পর্য্যন্ত মরে বটে।

ব্রাহ্মণ আমার সঙ্গে না পারিয়া গন গন করিতে করিতে পা হইতে চটির পাটি খুলিয়া লইয়া একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে ক্রোধ তিরোহিত হইয়া দৃষ্টি হইতে বাৎসল্য ক্ষরিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ দুই হাতে চটির পাটিটিকে মুখের সামনে উঁচু করিয়া ধরিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল—আমার নতুন চটি ! এই সবে কাশী আসবার আগে ঠনঠনে থেকে দেড় টাকায় কিনেছি ! আমার নতুন চটি !—

ব্রাহ্মণের স্বরে বেদনা মাখানো।

তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার যেমন হাসি পাইতেছিল তেমনি দুঃখও হইতেছিল। আমি চারিদিকের হাসির হররার মধ্যে অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া মুখভাব যথাসম্ভব গম্ভীর ও বিমর্ষ করিয়া বলিলাম—তাই তো ঠাকুরমশায়, আপনার নতুন চটির এক পাটি পড়ে গেল ......

—পড়ে গেল! বলতে লজ্জা করে না, মিথ্যাবাদী পাষণ্ড! তুই-ই তো ইচ্ছে করে বদমায়েসি করে' আমার চটির পাটি ফেলে দিয়েছিস। নইলে আমার পয়সা দিয়ে কেনা, হক্কের ধন, অমনি খামখা পড়ে গেলেই হল।—আমার এক্কেবারে আনকোরা নতুন চটি!—

ব্রাহ্মণের স্বর তিরস্কারের তীব্রতা হইতে চটির স্নেহে করুণার্দ্র হইয়া আসিল এবং দৃষ্টি তাহার জ্বালা ভুলিয়া শীতল হইয়া গেল। সে দুই হাতে অবশিষ্ট পাটিটিকে তুলিয়া ধরিয়া একবার আস্ফালন করিয়া আমাকে বলে—তুই ইচ্ছে করে, বদমায়েসি করে ফেলে দিয়েছিস!—আবার চটির শোকে করুণার্দ্র হইয়া বারংবার বলিতে থাকে—আমার নতুন চটি! আমার নতুন চটি!

আমি অতি মিনতির স্বরে বলিলাম—ঠাকুরমশায়, আপনি যদি কিছু মনে না করেন তো আমি দাম দিচ্ছি, আপনি কলকেতা গিয়ে আর একজোড়া নতুন চটি কিনে নেবেন। আপনার মতন ব্রাহ্মণকে জুতো দান করলে আমার অক্ষয় পুণ্য হবে।

ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া নাসারন্ধ্র ফুলাইয়া টিকি নাড়িয়া বলিল—অ্যাঁ বেটা পাজি নচ্ছার হতভাগা বেল্লিক অকালকুষ্মাণ্ড! আমি তীর্থ করে ফিরে যাবার পথে তোর দান প্রতিগ্রহ করে পতিত

হই আর কি? তেমনি তোর মতলব বটে! নইলে আর ইচ্ছে করে আমার নতুন চটি পাট্‌টে ফেলে দিস। আমার নতুন চটি!

ব্রাহ্মণকে আর অধিক ঘাঁটানো নির্দ্দয়ের কার্য্য হইবে বলিয়া আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ব্রাহ্মণ কিন্তু কিছুতেই শান্ত হইতে পারিতেছিল না। সে একবার একপায়ে চটি পরিয়া বসে; একএকবার বা খালি পা দেখে; কখনো বা পরম আগ্রহে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া চটির পাটি চোখের সামনে তুলিয়া করুণ নেত্রে দেখে; দেখিয়া দেখিয়া আবার নামাইয়া রাখে। থাকিয়া থাকিয়া একএকবার আমার দিকে সক্রোধ দৃষ্টিতে চাহে, কলিকাল বলিয়া রক্ষা, নতুবা ব্রাহ্মণের রোষানলে আমি ভস্ম হইয়া যাইতাম; একএকবার ব্রাহ্মণ অস্ফুট ক্রোধমিশ্র করুণ স্বরে বলে—আমার নতুন চটি! আমার আনকোরা চটি!

খানিকক্ষণ এইরূপ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ চটির পাটিটি চোখের সম্মুখে ধরিয়া দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিল—যাক, এ একপাটি থেকেই বা কি হবে, এ পাটিও যাক!—

এই বলিয়াই গাড়ীর জানালা দিয়া চটির পাটিটি টান মারিয়া দূরে ফেলিয়া দিল। কিন্তু ফেলিয়া দিয়াই জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সতৃষ্ণ নয়নে সেই চটির পাটিটিকে দেখিতে লাগিল। যখন আর দেখা গেল না তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ব্রাহ্মণ দুঃখ ও ক্রোধমিশ্র বিকৃত স্বরে আমাকে বলিল—কেমন? মনস্কামনা পূর্ণ হল তো?

আমি হাসিয়া বলিলাম—এ পাটি ফেলে দিয়ে আপনি আর তেমন বেশি কি করলেন। সঙ্গীহারা হয়েই তো বেচারা একেবারে

নিষ্কর্ম্মা হয়ে পড়েছিল; কারণ আপনি তো বলেইছেন এই একটু আগে যে আপনি একানড়ে নন যে এক পায়ে জুতো পরবেন।

ব্রাহ্মণ মুখ খিঁচাইয়া বলিল—হাঁ হাঁ, ভারি আনন্দ হয়েছে। বাক্যবাগীশ! কথার ধুকুড়ি! বদমায়েস! পাজি! হতভাগা! ···

ব্রাহ্মণের গালির 'ট্রেন' শেষ হইবার পূর্ব্বে ট্রেন রাণীগঞ্জে থামিল। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া প্লাটফর্ম্মে পাচারি করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম ভট্টাচার্য্যের প্রথম পাটি চটি পাঞ্জাবীর মোটের টানে সরিয়া পড়িয়া গাড়ীর পাদানের নীচের ধাপে আটকাইয়া আছে। আমি ইহা দেখিয়া বলিয়া উঠিলাম—ঠাকুর-মশায়, এই যে আপনার চটি এখানে আটকে আছে!—

এবং তারপর সেই চটির পাটিটিকে উদ্ধার করিয়া ভট্টাচার্য্যের হাতে দিলাম।

ভট্টাচার্য্য হারাণো পুত্র ফিরিয়া পাওয়ার মতো ব্যগ্র আগ্রহে সেই চটির পাটিটিকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল—দেখেছ একবার নষ্টামিটে! চটির পাটিটে লুকিয়ে রেখে এতক্ষণ আমার সঙ্গে তামাসা করা! আমি তোর বাপের বয়সি, আমার সঙ্গে তামাসা! ওরে হতভাগা পাজি! তামাসাই যদি করছিলি তবে যখন আমি ওপাটিটে ফেলে দিলাম, তখন আমায় বারণ করলিনে কেন? আমি ফেলে টেলে দিলাম এখন এসে বলছেন ঠাকুরমশায় আপনার চটি! আমায় একেবারে নেহাল করে দিলেন আর কি!

ভট্টাচার্য্যের চোখ ছলছল করিতেছিল। তাহার ভাব দেখিয়া আমার সন্দেহ হইতেছিল লোকলজ্জা অন্তরায় না হইলে ব্রাহ্মণ

হয় তো হারাধন চটির পাটিটিকে চুম্বন করিয়া অশ্রুজলে স্নান করাইত।

ব্রাহ্মণ চটির পাটিটিকে দেখিয়া দেখিয়া আপনার পাশে বেঞ্চির উপর রাখিল। তারপর পোঁটলাটি কোলের উপর তুলিয়া আস্তে আস্তে খুলিয়া চটির পাটিটিকে পোঁটলায় বাঁধিয়া রাখিল। হয় তো তাহার মনের মধ্যে একটু আশা জাগিতেছিল যে ফেলিয়া-দেওয়া পাটিটিও হয় তো এমনি করিয়া কোনো আশ্চর্য্য উপায়ে আমি ফিরাইয়া দিতে পারিব। কিংবা পণ্ডিত লোকে এক রকম ভুল দুবার করে না বলিয়াই হয় তো এ পাটিটিকে ব্রাহ্মণ আর ফেলিয়া দিতে পারিল না।

ফিনিক্স

আমার বয়স যখন চৌদ্দ তাহার বয়স তখন তের। তাহার নাম মালতী। সে আমার দিদির ননদ।

দিদির বিবাহের বছর দুই পরে যখন তাঁহার শ্বশুরবাড়ী গেলাম তখন তাহাকে দেখিলাম। তাহাকে দেখিতে বেশ ভালো লাগিল; দেখিতে দেখিতে আমার মন কেমন এক অপূর্ব্ব রসে রসিয়া উঠিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার সহিত পরিচয় হইয়া গেল। পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় তাহার সঙ্গ-বৈচিত্র্য, তাহার বচন-মাধুর্য্য, তাহার সরস-প্রকৃতি আমাকে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিল।

যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম তখন বুঝিলাম মালতীর অদর্শন আমাকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে।

তখন দিদির প্রতি আমার মমতা অকস্মাৎ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। আমি দিদির বাড়ী ঘন ঘন যাইতে আরম্ভ করিলাম।

প্রথম দিন মালতীর সহিত যেমন সহজ ভাবে মিশিয়াছিলাম, দ্বিতীয় দিন তেমন সহজে পারিলাম না। অল্পে অল্পে অনুভব করিতে লাগিলাম আমার অন্তরে এমন একটু সরস পরিবর্ত্তন আসিয়াছে যাহা আনন্দ ও বেদনা একসঙ্গেই দান করে।

মালতীকে আমার কেবলি দেখিতে ইচ্ছা হয় বলিয়া তাহার দিকে চোখ তোলা দায় হইয়া উঠিল; তাহার সহিত কথা কহিবার জন্য প্রাণ যতই ছটফট করে কণ্ঠ ততই রুদ্ধ হইয়া আসে; মনে হয় আমার প্রত্যেক দৃষ্টি ও প্রত্যেক বাক্যের উপর পাহারা দিয়া যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওত পাতিয়া বসিয়া আছে।

চক্ষু যদি তাহার দিকে বিমুখ হইয়া বসিল, কর্ণ তবে সজাগ হইল। মালতীর মৃদু কথা, চাপা হাসি, চরণধ্বনি পর্য্যন্ত আমার কানে ধরা পড়িতে লাগিল। সে আমার নিকটে আসিলে তাহার দিকে চাহিতে পারিতাম না বলিয়া সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তাহার আগমন অনুভব করিতাম।

প্রকাশ যখন কঠিন হইল ছলচুরি তখন সহজ হইয়া আসিল, চোখ তখন কথা কহিবার ভার লইল, মন তখন বিরলের খোঁজে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

দিদির বাড়ী হয় তো দু'তিন দিন থাকিতাম। প্রতিদিন মালতীর সহিত মিলনের চোরা মুহূর্ত্তগুলি মিলাইয়া বড়জোর পাঁচ মিনিট হইত। কিন্তু তাহাতেই কত সুখ!

কিন্তু প্রণয়ধর্ম্মটা এমনি অগোপ্য যে কিছুতেই তাহা অপ্রকাশ রাখা যায় না, লুকাইতে গিয়াই ধরা পড়িতে হয়।

আমরাও ধরা পড়িলাম। দিদি টের পাইয়া একদিন হাসিতে হাসিতে মালতীকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা ঠাকুরঝি, বল্‌ত এখন যদি তোর স্বয়ম্বর হয় তবে তুই কার গলায় মালা দিস্‌?

মালতী লজ্জায় আনন্দে কৌতুকে অভিভূত হইয়া চাপা গলায় বলিল—যাঃ!

কিন্তু তাহার বক্রদৃষ্টিখানি তাহার স্বকর-গ্রথিত বরমাল্যখানির মতো আমায় অভিনন্দন করিয়া গেল।

ক্রমে এই কথা লইয়া দিদির বাড়ীর লোকেরা আমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। দিদির বাড়ী যাওয়া আমার ভার হইয়া উঠিল।

কথাটা ক্রমে আমাদের বাড়ীতেও পৌঁছিল। মা বাবাকে ধরিলেন যে মালতীর সঙ্গে আমার বিবাহ দেওয়া হোক। আমাদের বিবাহসম্বন্ধ চলিতে লাগিল। আমি আনন্দে বিভোর হইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম।

এই সময়ে দিদি আমাদের বাড়ী আসিল। বাবা, দিদির সঙ্গে আমার বিবাহের পরামর্শ করিতে বসিলেন। দিদি বলিল—সুরেশের সঙ্গে মালতীর বেশ সাজন্ত হবে না, মোটে এক বছরের ছোট বড়, তাতে আবার মালতীর বাড়ন্ত গড়ন, দুদিনেই সুরেশের চেয়ে বড় হয়ে উঠবে। তার চেয়ে মালতীর ছোট বোন মল্লিকার সঙ্গে সুরেশের বিয়ে হলে বেশ সাজন্ত হয়, সে মেয়েটিও বেশ।

দিদির একটি কথায় আমার সমস্ত ভাগ্য ওলটপালট হইয়া গেল। দিদি বাহিরের সাজন্তকে অন্তরের অপেক্ষা বড় করিয়া

আমার সর্ব্বনাশ করিয়া দিলেন। মানুষের ভাগ্যের গতি এমনি একটি সামান্য আঘাতেই পথহারা হইয়া পড়ে।

একই দিনে মালতী ও মল্লিকার বিবাহ। আমি লাল চেলি পরিয়া টোপর মাথায় দিয়া সঙের মতো মালতীর বাড়ীতে গিয়াছি মল্লিকাকে বিবাহ করিতে! আর একজন কোথাকার কে আমারই মতন সাজিয়া বিবাহ করিতে আসিয়াছে মালতীকে!

আমি যখন মল্লিকার পিতাকে গৌরীদানের ফলাধিকারী করিতেছিলাম, মালতীর ভাগ্যসূত্র তখন একজন 'কোথাকার কে'র সঙ্গে জড়িত হইয়া যাইতেছিল।

প্রজাপতির পরিহাসে এমনি করিয়া আমাদের অদৃষ্টসূত্রে বিষম জট বাঁধিয়া গেল।

মনটা যেন ভাঙিয়া গেল, দৃষ্টির সম্মুখ হইতে বিবাহবাড়ীর সমস্ত আলোকমালা যেন নিবিয়া আসিল, নহবতের সানাইয়ের সুর যেন আমারই অন্তরভেদী ক্রন্দনে বাজিয়া উঠিল।

বাসরঘরের মেয়েদের উৎপাতে ও নিজের অন্তরবেদনায় অবসন্ন হইয়া ভোরের দিকে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। ললাটে কাহার কোমল করপল্লবের মধুস্পর্শে আমি চমকিত হইয়া চেতনা পাইলাম।

ঘরের প্রদীপ নিবিয়া গেছে। বাসরঘরের মেয়েরা প্রায় সকলেই চলিয়া গেছে; দু একজন ফরাশের উপর বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। প্রত্যূষের ক্ষীণ আলোকে দেখিলাম আমার শিয়রে বসিয়া একটি কিশোরী আমার কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছে—তাহার লাল চেলি পরা, হাতে হলুদরঙা সূতো বাঁধা, সীঁথিতে একরাশ দীপ্ত সিঁদূর ঢালা, কপালে চন্দনবিন্দু আঁকা।

আমি প্রথমে মনে করিলাম সে বুঝি মল্লিকা। কিন্তু অনুভবে বুঝিলাম মল্লিকা আমার পার্শ্বে নিদ্রিতা। তখন ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখিলাম সে আমার জন্মজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলের স্বপ্নাবেশের মতো, স্বর্গোদ্যানের নিষিদ্ধ ফল, আমার ভাগ্যগগনের নষ্টচন্দ্র, মালতী!

আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় অবশ হইয়া গেল, চেতনা শিথিল হইয়া আসিল, আমি আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, কোনো কথা বলিতে পারিলাম না।

* * * *

তারপর কত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে তবু আমি মালতীকে ভুলিতে পারি নাই, ইচ্ছাও করি নাই। তাহার প্রেম ক্রমে ক্রমে আমার নিকট ভাবগত হইয়া উঠিয়াছে।

মালতীকে না পাইয়া যত ক্রোধ পড়িয়াছিল মল্লিকার উপর। আমি তাহার সহিত কোনো কথা তো কহিতামই না, তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেও আমার ইচ্ছা হইত না; আমার মনে হইত যেন তাহার জন্যই আমি মালতীকে হারাইয়াছি। কখনো কখনো আমার মা বা দিদি অনেক জেদাজেদি করিয়া মল্লিকাকে আমার ঘরে শয়ন করাইয়া যাইতেন কিন্তু আমি তাহাকে আমার শয্যায় স্থান দিতাম না। সে ভয়ে লজ্জায় জড়োসড়ো হইয়া আগাগোড়া কাপড় মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকিত; আমার বিরাগ তাহাকে এমনি কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছিল!

শ্রাবণ মাস। ঝুলনপূর্ণিমা। আজিকার রাতেও আমি মল্লিকার অস্তিত্ব ভুলিয়া দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছিলাম। অনেক রাত্রে প্রবল বৃষ্টিধারার ঝম ঝম শব্দে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

মনে হইল এ যেন জ্যোৎস্না-রাত্রির বিরহ-ক্রন্দন, এ যেন তাহার অভিসার-যাত্রার নূপুরধ্বনি! প্রাণ আমার ভাবরসে ভরিয়া উঠিল। আমি আর শুইয়া থাকিতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া কবিতা লিখিতে লাগিলাম।

সেই কোন মায়াময় কল্প-বৃন্দাবনে এমনি রাতে একদিন যে প্রেমলীলার হিন্দোল লাগিয়াছিল তাহারই ঢেউ এই যুগযুগান্ত পারে আমারই হিয়ার পরে আঘাত করিতে লাগিল। আমার চিত্তও আজ সেই সাহসিকা রাধিকার মতো কোনো ভাবমধুর কালিন্দীকূলের নীপশাখায় ঝুলনা বাঁধিবার জন্য অভিসার করিতেছিল।

"আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই প্রেম-অভিসার পাগলিনী রাধিকার,
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে।"

রসে আনন্দে উচ্ছ্বসিত অন্তরে কাগজের পর কাগজ এমনি সব ভাবললিত কবিতায় ভরিয়া তুলিতেছিলাম। আজিকার এই নিবিড় বর্ষার সরস হিল্লোল মল্লিকার বক্ষতটেও বোধহয় আঘাত করিতেছিল। তাহারও চক্ষে ঘুম ছিল না, সে শয্যার উপর অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। আমার কিন্তু তাহার দিকে মন দিবার অবসর ছিল না।

দমকা বাতাস ঘরে ঢুকিয়া প্রদীপ নিবাইয়া আমার কবিতার একখানা কাগজ উড়াইয়া লইয়া গেল, মেঘাবৃত ম্লান জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোক ঘরের মধ্যে উপচাইয়া পড়িল। আমি আলো জ্বালিয়া কবিতার কাগজ কুড়াইয়া আনিব মনে করিতেছি; মল্লিকা

তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেখানি কুড়াইয়া আনিয়া আমার সম্মুখে হাত বাড়াইয়া ধরিল।

বিবাহের পর এতকাল পরে আজ মল্লিকার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলাম। একি! এ যে ঠিক মালতী!

মল্লিকাকে আমি উপেক্ষা করিতেছিলাম বলিয়া যৌবন তাহাকে একটুও উপেক্ষা করে নাই। বরং সে আমার উপেক্ষার অবসর পাইয়াই মল্লিকার প্রত্যেক অঙ্গ পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে সাজাইয়া তুলিয়াছিল। তার উপর একখানি নীলাম্বরী শাড়ীর নিবিড় বেষ্টনে তাহাকে আজিকার মেঘময়ী পূর্ণিমার মতোই মনে হইতেছিল। আজিকার ঘনবর্ষার উতলা আনন্দে তাহারও অন্তরে প্রণয়-নিবেদনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া থাকিবে। তাই সে আজ মালতীর রূপে সাজিয়া একখানি কবিতার তুচ্ছ কাগজ উপলক্ষ করিয়া প্রেমের প্রথম পরিচয় স্থাপনের জন্য আমার প্রাণের কপাটে ভীরুর মতন যে মৃদু আঘাত করিল তাহাতে তাহাকে আর প্রবেশের অধিকারে বঞ্চিত রাখিতে পারিলাম না। তাহার অপ্রতিভ মুখখানি দুই হাতে ধরিয়া তাহার অধরপুটে প্রেমের চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া উভয়েই বিরহের সকল গ্লানি হইতে মুক্ত হইলাম।

চীনদেশে

চীনের বিরুদ্ধে পূর্ব্বপশ্চিমের সভ্যতাভিমানী জাতিগণ যখন রণদুন্দুভি পিটিয়া দিয়াছিলেন, তখন ইংরেজ রাজার তরফ হইতে ভারতীয় সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহাদের আহার্য্যসংস্থান লইয়া রণভীরু আমাকেও সেই অজ্ঞাত সুদূর দেশে যাইতে হইয়াছিল। কারণ আমি কমিশেরিয়েটের বড়বাবু ছিলাম।

আমার যাইবার সময় বৃদ্ধ পিতামাতার সজল নেত্রের শুভ-কামনা, তরুণী স্ত্রীর বিরহ-বেদনা, সাংঘাতিক অস্ত্রের সম্ভাষণ-ভীতি আমার সঙ্গ লইয়াছিল। গৃহচত্বরের কীট বাঙালীর জীবনে এত লাঞ্ছনা সহ্য শুধু এক মুঠা অন্নের জন্যই, দেশের জন্য নয়।

সৌভাগ্যের বিষয় রণস্থল হইতে আমাদিগকে ২।৩ মাইল তফাতে রাখা হইত। তবুও দেখিতে পাইতাম সন্ধ্যার মলিনিমা উজ্জ্বল করিয়া "ছুটিল একটি গোলা লোহিত বরণ", সে "আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন" হইত না, বরং অস্ত্র রণরণিতে কর্ণ বধির হইয়া আসিত এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াটা তখন স্বাভাবিক থাকিত ইহা মিথ্যা গর্ব্ব করিয়াও বলিতে পারি না।

একজন চীনা ভদ্রলোককে ইংরেজেরা গোয়েন্দারূপে পাইয়া-ছিলেন। লোকটার নাম লিয়াংফু। তাহাকে প্রথমাবধিই আমার চক্ষুশূল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কেন, কি জানি? হয় তো সে স্বদেশ ও স্বজাতিদ্রোহী বলিয়া।

লিয়াংফু আমার সঙ্গে মিশিবার জন্য কিন্তু খুব চেষ্টা করিত। প্রশ্নপরম্পরায় আমাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিত। সে যত আমাকে

বিরক্ত করিত, আমার মুখ তত বন্ধ হইয়া যাইত। তখন ভায়ার ছোট ছোট গোল গোল চোখ দুটি বনবিড়ালের চোখের মতো জ্বলিয়া উঠিয়া ভয়ঙ্কর দেখাইত।

আমাদের তাঁবুতে মধ্যে একটা বড় হলঘর ও দুপাশে দুটা কুঠরী ও 'বাথরুম' ছিল। একটা কুঠরী অধিকার করিয়াছিলাম আমি, অপরটা ছিল লিয়াংফু ভায়ার অধিকারে। লিয়াংফু ভায়া মধ্যে মধ্যে আমার কামরায় আসিয়া আমার কাগজপত্র ঘাঁটিয়া, বাংলা শিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া বড় উৎপাত করিত। আমি ভায়ার ঘরে কদাচিৎ যাইতাম। হলঘরটিতে আমার আপিশ ও আশেপাশে নানাবিধ খাদ্য ও অখাদ্য দ্রব্য ছড়ানো থাকিত।

তাঁবুতে দরজা আঁটিবার জো নাই। পরদা ফেলাই চরম আবরু। লিয়াংফু ভায়া প্রায় পর্দা ফেলিয়া কি লেখাপড়া করিত। আমি বাঙালীসুলভ কৌতূহলে মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখিতাম। ভায়া লেখাপড়া শেষ করিয়া তুলি দিয়া চিত্রিত কতকগুলি পাতলা কাগজ ঘরের উনানের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া একখানা কাগজ চিঠির আকারে ভাঁজিয়া লইয়া বাহির হইয়া যাইত। আমি দূরে দূরে থাকিয়া তাহার পিছু লইতাম। ভায়া বনবিড়ালের মতো তিন লম্ফে বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া যাইত; আমি অপ্রতিভের মতো পায়ের লতা, কাপড়ের কাঁটা ছাড়াইতে ছাড়াইতে ও পাথরে টোকর খাইতে খাইতে কোনমতে শিবিরে ফিরিয়া আসিতাম।

একদিন দেখিলাম লিয়াংফুভায়া কি লিখিতে লিখিতে লেখার উপর ব্লটিং কাগজ চাপা দিয়া তাহার উপর মাথা রাখিয়া বড়

কান্নাটাই কাঁদিতেছে ; এদিকে হাতের কালীমাখা তুলিটা তাহার গালে দিব্য চীনা অক্ষর রচনা করিতেছিল ; ভায়ার তখন সেদিকে খেয়াল ছিল না। ক্ষণেক পরে মসিলিপ্ত কপোলে সৈনিকদের বিদ্রূপহাস্য সংগ্রহ করিয়া ভায়া বাহির হইয়া গেল। আমি সেদিন সঙ্গে গেলাম না। ভায়ার কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ব্লটিং কাগজের শুভ্রকলেবরকে উল্কিচিত্রিত করিয়া বহু চৈন অক্ষর সোজা, কাত, আড় হইয়া বসিয়া শুইয়া আছে। টেবিলের উপর ভায়ার একখানা ছোট আয়না ছিল ; সেটাকে কাত করিয়া ব্লটিং কাগজের উপর ধরিয়া কাগজখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উল্টা অক্ষরের সোজা প্রতিচ্ছায়া হইতে অনেক অক্ষর অনেক অসংলগ্ন কথা বাহির করিয়া ফেলিলাম। মন আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। অহো দারুণ বিধাতা, কোথায় আমায় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের শীলোৎকীর্ণ অদ্ভুত সমস্ত লিপি পাঠ করিতে দিবে, কিংবা কোথায় আমাকে বঙ্গের প্রধান ডিটেকটিভের পদ অলঙ্কৃত করিতে দিবে, না আমায় কমিশেরিয়েটের বাবু করিয়া চীনরাজ্যের দারুণ শীত ও বিকট যুদ্ধ সম্ভোগ করিতে পাঠাইয়াছ !

ব্লটিং কাগজ হইতে 'প্রিয় টিশি', 'বসন্তোৎসবের সময়,' 'কমিশেরিয়েট বাবুর তাঁবুতে,' 'আগুন', 'বারুদ' প্রভৃতি কয়েকটি অসম্বদ্ধ কথা মাত্র আবিষ্কার করিলাম। ভায়ার চিন্তাপ্রণালীর একটা খেই ধরিতে পারিলাম না। চীনপ্রবাসে তদ্দেশীয় ভাষায় আমার যে অধিকার জন্মিয়াছিল তাহাতে অতিকষ্টে বুঝিলাম 'টিশি' অর্থে 'সুন্দরী'। ভায়ার প্রাণেও প্রেম আছে দেখিতেছি ; এই প্রেমের পশ্চাতে মস্ত একটা কিন্তুও আছে বোধ হয়।

* * * *

রুষ্ট রুষ মাঞ্চুরিয়া দখল করে দেখিয়া অন্যান্য বলগণ চীনের প্রতি অসীম দয়া প্রকাশ করিয়া শান্তি ঘোষণা করিলেন। বীরগণের অস্ত্রসম্ভাষণ থামিয়া গিয়াছে, এখন ভীরু আমরা অবাধে সর্ব্বত্রই প্রায় বিচরণ করিতে পারি। এখন গৃহে ফিরিবার জন্য প্রাণটা বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের ছাউনি কুয়েনলুন পর্ব্বতের একটা অধিত্যকার মধ্যে। কি দারুণ শীত! চারিদিকে শুধু পাথর, গাছপালা জঙ্গল। আমি এখানে একখানা 'নির্ঝরিণী দূত' লিখিয়া ফেলিতে পারিতাম, কিন্তু আশেপাশে সঙ্গিনের খোঁচা কল্পনা করিয়া আমার কবিতা-বধূ বঙ্গের নিরাপদ আম্র-মুকুলসুরভিত কুঞ্জবনে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল।

এদিকে শান্তিবাক্য উচ্চারিত হওয়াতে সকলেই খুব নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত। সেই সময়ে আমি বাড়ীর পত্রে সংবাদ পাইলাম আমার তরুণী ভার্য্যা প্লেগকবলিত হইয়াছেন। আমি বৃদ্ধ না হইলেও সে আমার 'প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী' ছিল। সকলের আনন্দের মধ্যে আমার ক্রন্দনটা অশোভন হইবে বলিয়া দরী-মুখোচ্ছ্বসিত উৎসমুখে আপাতত পাষাণ চাপা দিয়া রাখিলাম। এপাশ ওপাশ দিয়া জল যে একেবারে উদ্গলিত হইত না, তাহা বলিতে পারি না।

আমি মনকে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য পঞ্চামুনি প্রভৃতি দেবমন্দির ও লামা সন্দর্শনে যাইতাম। একদিন বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম; মন যখন নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকে তখন অপর ইন্দ্রিয় বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কতদূর কি করিল তাহার বড় একটা হিসাব রাখে না। সহসা একটা কোলাহল আমার চমক ভাঙিয়া দিল। দেখিলাম, নির্জ্জন হরিৎ প্রান্তর।

একটি চীনা রমণী ক্রন্দনরতা এবং কয়েকজন চীনা ও য়ুরোপীয় যুদ্ধরত। যুদ্ধাবসানে মৃতাবশিষ্ট কয়েকজন চীনা প্রতিহিংসার লেলিহান সঙ্গিন-জিহ্বা বিস্তার করিয়া আমার দিকে ছুটিতে লাগিল। আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই যে উহারা আমাকেই লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উদ্যত করিয়াছে। পশ্চাতে রমণীকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, 'বিদেশী, পলাও'। আমি ফিরিলাম, রমণী হস্তসঙ্কেতে তাহার অনুবর্ত্তী হইতে সঙ্কেত করিল। যে দিকটায় দৌড়িলাম, সেদিকটায় বড় ঘন বন; প্রাণের ভয়ে ব্যতীত সে পথে আমি একপাও অগ্রসর হইতে পারিতাম না। কিছুদূর যাইয়া একখানি কুটীর দেখিলাম। রমণী আমাকে তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দ্বারের পাশে একখানি পাথরের উপর বসিয়া আশেপাশের লতাগুল্ম হইতে ফুল ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া মাথায় কানে পরিতে লাগিল, আর মিষ্ট গলায় করুণ রাগিণীতে গান ধরিয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে একজন চীনা আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—টিশি, এদিকে একজন বিদেশীকে দেখেছ ?

টিশি গান থামাইয়া বলিল—বিদেশী ? কৈ ?

'তবে সেটা পলাইয়াছে' বলিয়া পুরুষটা চলিয়া গেল। টিশি আবার গান ধরিল। এই কি লিয়াংফুভায়ার টিশি ?

অনেকক্ষণ গৃহে আবদ্ধ রহিলাম। টিশির গান আর থামে না। আমাকে কি ভুলিয়া গেল নাকি ? আমি আস্তে আস্তে কাঠের দেয়ালে টোকা দিয়া ডাকিলাম 'টিশি।' টিশি চাপা গলায় শুধু বলিল 'চুপ।' আবার গান। খানিক পরে আর একটা লোক আসিয়া টিশির সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। আমি অখণ্ড মনোযোগ দিয়াও তাহাদের একটা কথাও বুঝিতে

পারিলাম না। কপাটের ফাঁকে চোখ দিয়া অতি কষ্টে দেখিলাম সে স্বয়ং লিয়াংফু ভায়া। ভায়া যাইবার সময় অপেক্ষাকৃত শ্রবণসক্ষম উচ্চস্বরে বলিয়া গেল—'এই চিঠিতে শেষ উপদেশ দিলাম; ধরা পড়ার ভয়ে মতলব নিত্য নূতন করিতে হইতেছে।' টিশি কিছু বলিল না।

টিশি গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া আমার নিকটে আসিল। আমি ধন্যবাদ জানাইলাম। আমি যে লিয়াংফুকে চিনিতে পারিয়াছি ইহা বলিবার জন্য আমার বাঙালীস্বভাব আকুলিব্যাকুলি করিতে লাগিল। কিন্তু আমি সংবৃত হইয়া টিশিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'তুমি এখানে একলা থাক?' টিশি ঘাড় নাড়িয়া হাসিয়া বলিল 'না।' আমি এ হাসিটুকু বাঙালীভাবে অনুবাদ করিয়া বলিলাম—'তোমার স্বামী তোমার সঙ্গে থাকেন বুঝি?' টিশি রজতকিঙ্কিণির মতো মধুর হাস্যে মুখর হইয়া বলিল 'আমি কুমারী।' আমি নিজের ভ্রম সংশোধন করিয়া তাড়াতাড়ি বলিলাম 'যিনি এখন তোমার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তিনি বোধহয় তোমার প্রণয়ী, ভাবী স্বামী?' এবার টিশি আমাকে হাস্যতরঙ্গে প্লাবিত নিমজ্জিত করিয়া দিল। অনেক কষ্টে একটু দম লইয়া বলিল—'সে আমার ভাই।' হরি হরি! আমার সব রোমান্স মাটি হইয়া গেল? আমি অপ্রতিভ হইয়া প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য বলিলাম—'টিশি, আমি তবে যাই। যতদিন বাঁচিব এই বনবাসিনী টিশির পদপ্রান্তে আমার কৃতজ্ঞতা—বাঁচিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিবার অবকাশ পাইয়াছে বলিয়াই—লুণ্ঠিত হইবে?' টিশি বড় গম্ভীর হইয়া পড়িল। টিশি সকল অবস্থাতেই বড় মনোরম; তাহার নাম অন্বর্থ হইয়াছে। টিশি বলিল—'আজ তোমাকে বাঁচাইয়াছি, কাল হয় তো আমিই

তোমার মৃত্যু ঘটাইব। যতদিন না দেশে ফিরিয়া যাও আমায় কৃতজ্ঞতা জানাইয়ো না।' টিশির প্রত্যেক কথায় এমন একটা মোহিনী ছিল যে আমি তাহার মাদকতায় বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। আমি বলিলাম, 'টিশি, তোমার মতো কোমলহৃদয়া কখনো কাহারো মৃত্যুর কারণ হইতে পারে না।' গম্ভীরা টিশি এবার হাসিল। টিশি বলিল, 'মৃত্যুর কারণ হইতে পারি কি না এখন সে তর্ক করিবার সময় নাই। তোমার জীবন লইয়া দেশে ফিরিবার ইচ্ছা থাকিলে বসন্তোৎসবের রাত্রে তুমি শিবিরে থাকিও না।' আমি বলিলাম, 'কেন টিশি?' টিশি আবার গম্ভীর হইয়া বলিল, 'আমি ঐটুকু বলিয়াই আমার অধিকার-বহির্ভূত ও কর্ত্তব্যবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছি। আর কিছু বলিব না। চল তোমায় বনের বাহিরে রাখিয়া আসি।'

শিবিরে ফিরিয়া সে রাত্রে আর ঘুম হইল না। নানা অদ্ভুত জটিল অসংলগ্ন চিন্তায় রাত্রি কাটিয়া গেল। আমার প্রত্নতাত্ত্বিকগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গেল। লিয়াংফু ভায়াকে অধিকতর রহস্যাবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

এখন কি কর্ত্তব্য? আমাদের কাপ্তেন সাহেবকে বলিব? তাহাতে যদি আমার প্রাণদাত্রী টিশির কোনো বিপদ হয়? তাহার নাম বাদ দিয়া বলিলেও যদি ঘটনাসূত্রে সেও জড়িত হইয়া পড়ে? মহা বিপদ! টিশি উৎসবের রাত্রে বাহিরে থাকিতে বলিয়াছে। সেই রাত্রেই কোনো বিপদের সম্ভাবনা। দূর হোক, যাহা হইবার হইবে; শোকক্লান্ত মনে আর ভাবিতে পারি না।

উৎসবের দিন আসিল। সন্ধ্যা হইয়া গেল। আটটা বাজিল। কোনই সূত্র বাহির করিতে পারিলাম না। আর নিশ্চিন্ত থাকা

উচিত নয়। অবশেষে কাপ্তেন সাহেবকে খবর দেওয়াই ঠিক করিলাম।

চিন্তা হইতে অবসর লইয়া যেমন মুখ তুলিলাম, সম্মুখে একজন চীনাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিলাম। পরে তাহাকে আমার ভায়া লিয়াংফু মনে করিয়া উপেক্ষাভরে বাহিরে চলিলাম। চীনা বলিল—'বিদেশী, তুমি শিবির ছাড়িয়া যাও নাই?' এমন মিষ্টস্বর ভায়ার চৌদ্দ পুরুষে কাহারো ছিল না। এ স্বর টিশির। টিশির পরিচ্ছদ পুরুষের; হাতে লগুড়ের মতো কি একটা ছিল। টিশিকে এস্থলে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'টিশি, তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে?'

'লিয়াংফু আমার ভাই। সে তোমাদের গোয়েন্দা নহে; সে জননী জন্মভূমির লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লইবার জন্য ছদ্মরূপে তোমাদের সঙ্গ লইয়াছে। সেই তাহার ঘোড়ার পেটের সঙ্গে আমায় বাঁধিয়া লইয়া সন্ধ্যার পর শিবিরে আনিয়াছে। সকল রক্ষীই আজ উৎসবে উন্মত্ত, দ্বিধাশূন্য, আমাদের আসিতে কোনো কষ্ট হয় নাই।'

'তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?'

'সকল অত্যাচারীকে ধ্বংস করিতে।'

আমি বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে জিজ্ঞাসা করিলাম—'মাত্র তোমরা দুটিতে এই বিপুল সৈন্য কিরূপে ধ্বংস করিবে?'

টিশি এতক্ষণে একটু হাসিল। বলিল,—'লিয়াংফু নিজের কামরার নীচে বারুদের ক্যানেস্ত্রা ও ডিনামাইট পুঁতিয়া রাখিয়াছে। আজ সন্ধ্যার সময় প্রত্যেক তাঁবুর কানাতের ধারে ধারে বারুদ ছড়াইয়া দিয়াছে। শিবিরের সর্ব্বত্র তার অবাধগতি; সে আমাকে

এই তাঁবুতে রাখিয়া অপর দিকে আগুন দিতে গিয়াছে। আমার হাতে এই দেখিতেছ মশাল।' দেখিতে দেখিতে দিয়াশলাই জ্বলিয়া মশালকে চুম্বন করিল, মশাল মরণের জিহ্বা মেলিয়া লকলক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আমার বাঙালীরক্ত একেবারে হিম হইয়া গেল। আমি রুদ্ধকণ্ঠে কহিলাম,—'তুমি ডিনামাইটে আগুন দিলে তুমি সুদ্ধ মারা পড়িবে যে!'

টিশি হাসিয়া বলিল, 'তাতে কি? আমার মৃত্যুতে কাহারো ক্ষতি নাই; আমার মৃত্যুতে দেশের লাভ। তোমরা ইহা বুঝিতে পারিবে না। তোমাদের কৌলিকক্রিয়া পলায়নের শরণাপন্ন হও, আমার আগুন দিবার সময় হইয়াছে।'

আমি তাহার উদ্যত হস্ত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, 'সর্ব্বনাশ! কর কি?' আমি তাহার হাত হইতে মশালটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলাম।

টিশি তাহার কটিবন্ধে ছোরা ও রিভলভার দেখাইয়া বলিল 'দেখিতেছ! ছোরা নিঃশব্দে তোমার রক্ত পান করিবে।'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'তুমি যদি তাহা পারিতে তবে বাক্যের পূর্ব্বেই কার্য্য হইয়া যাইত। তুমি পারিবে না বলিয়াই তো আমার এত সাহস।'

তাহার হাত হইতে জ্বলন্ত মশালটা কাড়িয়া লইয়া ভালো করিয়া নিবাইয়া দিলাম। ফেলিয়া দিতে সাহস হইল না, কোথায় কোন বারুদকণার সাক্ষাৎ পাইয়া কি অনর্থ ঘটাইবে। টিশির কোমর হইতে ছোরা ও পিস্তল খুলিয়া লইলাম। আমি বুঝিয়াছিলাম টিশি আমায় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। ভগবান আমার চেহারাটা কালীঘাট বা আর্টষ্টুডিয়োর আদর্শে

বিদ্রূপের তুলিতে অঙ্কিত করেন নাই, টিশি তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া হার মানিয়াছে ইহা মনে করিয়া একটু গর্ব্বানুভব করিলাম, ভগবানের কৃপায় যে রক্ষা পাইয়াছি ইহা কিছুতেই তখন মনে পড়িল না।

টিশি কাঁদিয়া ফেলিল। বড় অভিমানের স্বরে পাতলা ঠোঁট দুখানি উল্টাইয়া উল্টাইয়া বলিল,—'তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম, আজ বেশ ঋণশোধ করিলে। লিয়াংফু যখন জানিবে আমি অগ্নিসংযোগ করি নাই, মূঢ়া নারীর দুর্ব্বলতায় একজন বিদেশীর নিকট অবহেলে পরাজিত হইয়াছি, তখন আমার মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু সে মৃত্যু শ্লাঘ্য নহে।'

আমি বলিলাম, 'তোমার কোন বিপদ ঘটিতে দিব না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।'

ঘরে একটা দামামা ছিল। তাহাতে ঘা দিয়া বিপদ ঘোষণা করিয়া দিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত শিবির সজাগ হইয়া উঠিল। আমি তখনো টিশির হাত বড় স্নেহের সহিত ধরিয়া ছিলাম। সে বলিল—'ও কি, তুমি বিপদসঙ্কেত করিলে, আমায় ছাড়িয়া দাও; মরি তো ভায়ের হাতেই মরিব, শত্রুর হাতে নহে।'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'মরিবার জন্য অত ব্যস্ত কেন? আমি তোমায় মরিতে দিব না।'

কাপ্তেন সাহেব দৌড়াইতে দৌড়াইতে আমার ঘরে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, 'বাবু, ব্যাপার কি?'

আমি সেলাম করিয়া বলিলাম, 'গুরুতর। চীনারা আজ শিবিরে আগুন দিবে। সর্ব্বত্র বারুদ ও ডিনামাইট্ ছড়ান আছে। একবার আগুন লাগিলে সর্ব্বনাশ হইবে।'

সাহেব ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আগুন আগুন শব্দ নৈশগগন পূর্ণ করিয়া ফেলিল। আমি ও টিশি নির্ব্বাক নিস্পন্দ। ঘণ্টাখানেক পরে সাহেব ফিরিয়া আসিয়া আমার করকম্পন করিয়া বলিলেন, 'বাবু, আজ বড় উপকার করিয়াছ। মোটে ৪।৫টা তাঁবু আর ২৫।৩০ জন লোক নষ্ট হইয়াছে। আর একটু গৌণ হইলে কি অনর্থপাতই না হইত।'

আমি বলিলাম—'সাহেব আমাদের কৃতজ্ঞতা এই রমণীর প্রাপ্য। ইনি সংবাদ না দিলে আমি কিছুই জানিতাম না।' তৎপরে টিশিকে বাঁচাইয়া সমস্ত ঘটনা সাহেবকে বলিলাম। সাহেব বড় খুসি। বলিলেন—'বাবু, এবার কলিকাতায় গিয়া যাহাতে তুমি ডিটেকটিভ বিভাগে বড় কাজ পাও আমি তাহাই করিব।' আমি হর্ষগদ্গদ হইয়া সেলাম করিলাম। আমি বলিলাম—'সাহেব, আমাদের রক্ষাকর্ত্রী তাঁহার স্বদেশীর কাছে ফিরিয়া যাইতে তো পারেন না।'

সাহেব সোৎসাহে বলিলেন—'না না, তা' কি কখন হয়। আমি উঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দিব। উনি স্বাধীনভাবে থাকিবেন।'

আমি সেলাম করিয়া কহিলাম, 'ইহাকে আমাকে বকশিশ করুন।'

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, 'কেন? তুমি ইহাঁকে লইয়া কি করিবে? তোমরা হিন্দু, ভিন্ন জাতির সংস্পর্শ তো তোমাদের নিষিদ্ধ।'

আমি বলিলাম—'সাহেব, আমাদের যদি সেই ভাবই থাকিত তবে এই চীনা মুলুকে তোমাদের গোমাংসের সরবরাহ করিতে

আসিতাম না। আমি সম্প্রতি বিপত্নীক হইয়াছি, আমি ইঁহাকে বিবাহ করিব।'

সাহেব খুব হাসিলেন। টিশি লজ্জায় মুখ নত করিল। আনন্দে আমার চিত্ত ভরিয়া গেল। এবং আমার রুচি দেখিয়া পাঠকের নাসিকা নিশ্চয় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

স্নেহ-রহস্য

কুমুদ বাবু হাজারিবাগ শহর হইতে তিন ক্রোশ দূরে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করিয়া অভ্রের কারবার করিতেন। কুমুদ বাবুর পাঁচ কন্যার পর একটি পুত্র হইয়াছে; সুতরাং পুত্রটি বড় আদরের, বাপ-মা'র নয়নের মণি, দিদিদের অঞ্চলের নিধি।

ফাল্গুন মাসের শেষে সেই গ্রামে প্লেগ দেখা দিল। ছোট্ট একটু গ্রাম—মৃত্যুর হাহাকারে ভরিয়া উঠিল। কুমুদ বাবু সপরিবারে শহরে পলায়ন করা যুক্তি-সঙ্গত স্থির করিয়া আয়োজন করিতে লাগিলেন; যান, বাহন সকলই দুষ্প্রাপ্য, সকলের গৃহেই মৃত্যুর হাহাকার, গ্রামে গাড়ী মিলিল না, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কেহ ভয়ে সেই গ্রামে আসিতে চাহিল না। অবশেষে কুমুদ বাবুর একটি কন্যার প্লেগের লক্ষণ দেখা দিল।

কুমুদ বাবু তৎক্ষণাৎ হাজারিবাগে ডাক্তার ডাকিতে চলিয়া গেলেন। বহু অর্থ-ব্যয়ে একজন ডাক্তার লইয়া আসিলেন। ডাক্তার রোগী দেখিয়া ঔষধ দিয়া চলিয়া গেলেন। এই সুদূর

পল্লীতে দরিদ্র কুমুদ বাবুর কন্যার যথোচিত চিকিৎসা হইতে পারিল না। অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া পড়িতে লাগিল।

কখন কি হয় ভয়ে ভয়ে দিন যাইতেছে, বৈকাল বেলা খোকারও জ্বর হইল। কুমুদ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী ভীত হইয়া ডাক্তার ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। রাত্রে কন্যাটির মৃত্যু হইল এবং খোকারও প্লেগ-লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

পাছে খোকা ভীত হয় বলিয়া উচ্ছ্বসিত শোক অন্তরে রুদ্ধ রাখিয়া পিতা কন্যার সৎকার করিতে গেলেন এবং জননী পুত্রকে বুকে করিয়া বসিয়া পুত্রকে লুকাইয়া লুকাইয়া নীরবে অশ্রু মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন।

সমস্ত রাত্রি উৎকণ্ঠা ও ডাক্তারের প্রতীক্ষায় কাটিয়া গেল—ডাক্তার আসিলেন না। তখন অনেক কষ্টে চতুর্গুণ ভাড়ায় একখানি ডুলি সংগ্রহ করিয়া কুমুদ বাবু রুগ্ন পুত্রকে শহরের হাঁসপাতালে লইয়া চলিলেন। কুমুদ বাবুর স্ত্রী ও কন্যাগণ পদব্রজেই চলিলেন।

অনেক বেলায় তাঁহারা হাঁসপাতালে গিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহাদের ভাগ্যক্রমে হাঁসপাতালের একটা ঘর খালি ছিল, তাঁহারা সেই ঘরটা ভাড়া লইয়া রহিলেন; ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

কুমুদ বাবু বলিলেন—"ডাক্তার বাবু, সবে মাত্র কাল রাত্রে আমরা একটি কন্যা হারিয়ে আজ আপনার আশ্রয়ে এসে পড়েছি; আপনি আমাদের রক্ষা করুন।"

ডাক্তার বাবু কেবলমাত্র ভদ্রতার খাতিরে "কোনো ভয় নেই আপনাদের", বলিয়া নিতান্ত উদাসীনভাবে চলিয়া গেলেন।

হাঁসপাতালের ডাক্তার নিত্য নিত্য অসংখ্য রোগীর আর্ত্তনাদ, রোগীর আত্মীয়দের বুকভাঙা দীর্ঘনিশ্বাস, মর্ম্মন্তুদ মৃত্যু দেখিতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; কাহারো ক্লেশ, কাহারো অনুনয় আর তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না। পরের কষ্ট, অন্যের মৃত্যু যাহার ব্যবসায়ের বিষয় সে তাহাতে ক্রমশ অভ্যস্ত হইয়া আপনার ব্যবসায়টাকেই মুখ্য করিয়া তোলে, পরের পীড়া তাহার নিকট গৌণ ও নগণ্য হইয়া উঠে।

এইজন্য কুমুদ বাবুর কাকুতি এই ডাক্তার বাবুর কাছে অসাধারণ মনে হইল না, ডাক্তার বাবু অপর দশজন রোগীর সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে কুমুদ বাবুর পুত্রকেও পরম নিশ্চিন্ত মনে দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই যে একটি পরিবার সবেমাত্র কাল রাত্রে একটি স্নেহপুত্তলিকে বিসর্জ্জন দিয়া আজ আর একটির প্রাণ তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়াছে সেজন্য যে একটা উদ্বেগ বা ব্যগ্রতা নরচিত্তে জাগিয়া উঠা উচিত তাহা ডাক্তারের সুপ্ত-অনুভূতি-চিত্তে কৈ দেখা গেল না।

কুমুদ বাবুর স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন—"ডাক্তার শুধু হাতে কখনো আমার ছেলেকে দেখ্‌বে না, তাকে রোজ রীতিমত দর্শনী দিয়ো। যাও, ডাক্তারকে একবার ডেকে নিয়ে এস।"

ডাক্তার বাবু নিজের বাংলার সম্মুখের ফুল-বাগানে আরাম-চৌকীতে কাত হইয়া সমবেত বন্ধুজনের সঙ্গে শীঘ্র শীত কমিয়া যাওয়াই প্লেগের কারণ, কাবুলের আমিরের ভারত-ভ্রমণ, ইত্যাদি বহু বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময়ে কুমুদ বাবু সেই স্থানে আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তার বাবু আলবোলার নল ওষ্ঠে চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ?"

কুমুদ বাবু বলিলেন, "খোকা বড় ছটফট করছে, আপনি একবার অনুগ্রহ করে এসে যদি দেখেন ?"

ডাক্তার বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এখন রোগী দেখা আমার duty নয়, আপনি রেসিডেণ্ট্ এপথিকারীকে বলুন গে।"

তখন কুমুদ বাবু কাতর মিনতির স্বরে বলিলেন, "ডাক্তার বাবু, আমাদের একটিমাত্র ছেলে তাকে আপনি বাঁচান।"

ডাক্তার বাবু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "আমারও একটি-মাত্র প্রাণ, তাকে আপনি একটু বিশ্রাম নিতে দিন।"

তখন কুমুদ বাবু চাদরে অশ্রু মুছিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে অমনি ডাকছি নে; আপনাকে পূরো দর্শনি দেবো— যতবার আপনি দেখবেন, ততবারই দেবো, আপনি শুধু একটু দয়া করে দেখবেন আসুন।"

ডাক্তার বাবু তখন একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আমার দর্শনী দিনে দুটাকা, সন্ধ্যার পর চার টাকা, তা জানেন তো ?"

কুমুদ বাবু বলিলেন, "আমরা আপনাকে তাই দেবো, আপনি আমাদের খোকাকে বাঁচিয়ে দিন্।"

ডাক্তার আলবোলার নল অন্য বন্ধুর হাতে দিয়া বলিলেন, "তোমরা পালিয়ো না যেন, আমি এই এলুম বলে।" তারপর কুমুদ বাবুকে বলিলেন, "চলুন।"

ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন, খোকা অত্যন্ত ছটফট করিতেছে, আর তাহার জননী ও ভগ্নী ব্যাকুল হইয়া আপনাদের সকল স্নেহ সকল যত্ন সকল স্বাস্থ্য যেন ঢালিয়া দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে চাহিতেছে। সেই স্তিমিত-প্রদীপ ঘরে মৃত্যুর আবছায়া যেন রোগীটিকে পরিবেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। প্লেগের

রোগী, বাঁচিবার আশা অল্প, ডাক্তার আলগোছে রোগীকে পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন, শিশুটির বয়স ৪।৫ বৎসর, মুখখানি রোগ-যন্ত্রণায় ম্লান হইলেও তাহার লাবণ্য নষ্ট হয় নাই। হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল, তাঁহারও গৃহে এমনি একটি শিশু আছে। কুমুদ বাবুর স্ত্রী ডাক্তারের সহিত কথা কহিয়া বলিলেন, "ডাক্তার বাবু, আমার এই বই আর নেই।" ডাক্তারেরও মনে পড়িল, তাঁহারও একটি বই পুত্র নাই। ডাক্তার কাগজ কলম লইয়া প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন্ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকার নাম কি?" কুমুদ বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "অসিতকুমার।" ডাক্তার বাবু চমকিয়া উঠিয়া আবার শিশুর মুখের দিকে চাহিলেন। ব্যাকুল মাতৃচক্ষু ডাক্তারের ভাববৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিল। অমঙ্গলআশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া কুমুদ বাবুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার বাবু, অমন করে উঠলেন কেন?" ডাক্তার বলিলেন, "আমারও এমনি একটি ছেলে আছে, তারও নাম অসিতকুমার।"

আর কোন কথা হইল না। ডাক্তার ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গমনোদ্যত হইলে কুমুদ বাবু চারিটি টাকা তাঁহার হাতে দিতে গেলেন। ডাক্তার বলিলেন, "আপনাকে টাকা দিতে হবে না।" ডাক্তার কিছুতেই টাকা লইলেন না।

তখন হইতে ডাক্তার অবসর পাইলেই অসিতকে দেখিয়া ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া প্রাণপণে তাহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন! প্লেগের রোগী বলিয়া আর ভয় রহিল না। রাত্রে ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিতেন, "যাই, ছেলেটাকে দেখে আসি।"

যে ডাক্তার পরের বেদনা অক্লেশে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া

উঠিয়াছিল, আজ তাহাকে আপনার পুত্রের স্নেহ-স্মৃতি কতকে উদ্বোধিত করিয়া দিল, তাহার সুপ্ত পরক্লেশানুভূতি জাগ্রত করিয়া দিল, তাহার নষ্ট মনুষ্যত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিল। আজ একটু চেহারার আদল, একটি নামসাদৃশ্য উপলক্ষ্য করিয়া নিখিল জগতের শিশুর মধ্যে তাহার পুত্রস্নেহ বণ্টন হইয়া গেল।

খুনে

শহরের বাহিরে জেলখানার হাতায় জেল-দারোগার বাসার খিড়কির বাগানে একলাটি খেলা করিতেছিল জেল-দারোগার সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে মিনু। একটা গোল পাথর পায়ের ঠেলায় ফুটবলের মতন বাগানময় গড়াইয়া লইয়া বেড়ানোই তার খেলা।

জেলখানার মতো খিড়কির বাগানও উঁচু দেয়ালে ঘেরা। কিন্তু এক দেয়ালে আটক আছে কত লোকের স্বাধীনতা, কত লোকের নিরানন্দ পাপের বোঝা; আর এ দেয়ালের অন্তরালে আছে শুধু ফুলের হাসি, সবুজ রঙের চোখজুড়ানো বাহার, প্রজাপতির স্বাধীন নাচ, আর মিনুর সরল পবিত্র আনন্দ।

মিনু খেলা করিতে করিতে শুনিল হঠাৎ কিসের শব্দ। চাহিয়া দেখিল একটা লোক খাটো জাঙিয়া ও ঢিলা কুর্তি পরা, গলায় পদক আঁটা, শিকারী বেরালের মতো ওত পাতিয়া কুঁজো হইয়া বাগানের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিতেছে।

সে লোকটা এদিক ওদিক চাহিয়া যখন দেখিল সেখানে একটি ছোট্ট মেয়ে ছাড়া আর কেহ নাই, তখন সে ফস করিয়া বাগানে ঢুকিয়া পড়িল, আর ঢুকিয়াই তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরদিকের খিল লাগাইয়া দিল।

তখন সে সোজা সটান হইয়া দাঁড়াইয়া হাঁপ ছাড়িল—সে নিশ্বাস আরামের, সে নিশ্বাস মুক্তির।

মিনু আজন্ম কয়েদির সঙ্গে পরিচিত, তার একটুও ভয় হইল না। অনেকের সঙ্গে তো তার খুব ভাব ভালোবাসা। এ লোকটাকে সে কিন্তু কখনো দেখে নাই, কাজেই এর সঙ্গে আলাপও ছিল না। মিনি লোকটার দিকে চাহিয়া দেখিল—লোকটা বেয়াড়া লম্বা চৌড়া প্রকাণ্ড। হাতের থাবাগুলো শুলতোলা লোহার হাতলের মতো, মুখখানা চৌকো কঠিন অস্থিময়, চোক দুটো ছোট ছোট, বেরালের মতো ভীষণ আর ধূর্ত্ত। তাহাকে দেখিয়া মিনুর তত ভালো লাগিল না।

লোকটা পিঁজরাভাঙা হিংস্র পশুর মতো একবার খুব আড়ামোড়া ভাঙিল; একবার মুক্তির সম্ভাবনায় দাঁত বাহির করিয়া হাসিল, তারপর মিনুর দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

মিনুর আর তাহার দিকে নজর ছিল না। সে একবার তাহাকে দেখিয়া লইয়া আপনার খেলা সুরু করিয়াছিল। সে পাথর ঠেলিতে ঠেলিতে, টলমল করিয়া হেলিতে দুলিতে আসিতেছিল—সে দেখে নাই যে লোকটা তাহার কাছে আসিয়াছে। সে পাথরে ধাক্কা দিতে গিয়া টলিয়া পড়িতেছিল—কিছু ধরিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দেখিল সেই লোকটা দাঁড়াইয়া আছে, সে তখন অসঙ্কোচে তাহার কুর্ত্তা ধরিয়া পতন সামলাইয়া লইল।

লোকটা অমনি প্রকাণ্ড জাঁতিকলের মতন হাত দুখানা মিনুর গলার দিকে বাড়াইয়া দিল। মিনু তার সরল চোখদুটি তাহার মুখের দিকে তুলিয়া আদরের স্বরে বলিল—তুমি সরে যাও! আমার পাথর ছিটকে তোমায় যদি লাগে!

সরল বালিকার সোহাগবাণী তাহাকে যেন বাধা দিল। লোকটা হাত গুটাইয়া মিনুর নিকট হইতে সরিয়া গেল।

মিনু লোকটার দিকে ফিরিয়া বলিল—ওগো এস না, আমরা দুজনে খেলি। তুমি হও ভাই মালি, আমি বাবু।

এই বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া একখানা কোদাল আনিয়া লোকটার কাছে বাড়াইয়া ধরিল। লোকটা কোদাল লইতে ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া মিনু বলিল—নেও, তুমি কোদাল নেও—এস আমরা খেলি।

কোদালের চকচকে ধার দেখিয়া লোকটার গোল চোক দুটো জ্বলিয়া উঠিল, চোখের পাতা মিটমিট করিল। সে আবার তখনি কেমন সঙ্কুচিত হইয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল—না না, আমার ও চাইনে! আমায় ও দিসনে!

মিনু কোদাল ফেলিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—না, তুমি বড় দুষ্টু! ঘিষ্টু, নানকুয়া ওরা বেশ! আমার সঙ্গে খেলা করে, বাবার কাজ করে। তুমিও এস, খেলবে এস। তুমি মাটি খুঁড়বে না? তবে জল তোল, ডোলের জল নালায় ঢেলে দেও, আমি তাতে নৌকো ভাসাব। এস—

মিনু কয়েদির কুর্ত্তা ধরিয়া টানিতে টানিতে কূপের ধারে লইয়া গেল। সেও যেন কোন প্রবল টানে অসহায়ের মতো একটি বালিকার আকর্ষণ মানিয়া চলিল।

মিনু কূপের পাড়ে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—দেখ দেখ, জলে আমার ছায়া পড়েছে। আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি, তুমি পাচ্ছ? ও কি! তোমার চোখ দুটো অমন কটমটে কেন? না, তুমি অমন করে চেয়ো না, আমার ভয় করে।

এই কাতর কথাগুলি লোকটার কঠিন হৃদয়ে যেন ঘা দিল। সে প্রসারিত হাত দুখানা বুকের উপর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া প্রাণপণ বলে চোখ বুজিয়া অতি মিনতির স্বরে বলিল—ওরে অবোধ, তুই ঝুঁকিসনে, কুয়োর কাছে আমায় ডাকিসনে! ওসব দেখলে আমার গায়ে মরণের জ্বর আসে।

মিনু সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া অতবড় লোকটার ভয়কাতর ভাবভঙ্গি দেখিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—দূর বোকা, তোমার ভয় কি, তুমি থাকতে আমি পড়ব কেন?

সে লোকটা যেই দেখিল মিনু সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অমনি তাহাকে এক ধাক্কায় কূপের ধার হইতে সে সরাইয়া দিল। তাহার রূঢ় ধাক্কায় মিনুর ভর্ৎসনাভরা দৃষ্টি অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। মিনু ক্রন্দনকম্পিত কণ্ঠে বলিল—যাও, তুমি ভারি দুষ্টু! তুমি আমায় মারলে?

লোকটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার অভিমানের কান্না দেখিল। তাহার সকল কঠোরতাই যেন গলিয়া গলিয়া বালিকার অশ্রুরূপে তাহার প্রাণকে ধৌত নির্ম্মল করিয়া দিতেছে। তাহার কণ্ঠ এবার কোমল হইয়া পড়িল, সে বলিল—নে নে, আর কাঁদিসনে। তুই আমায় অমন করে কোদাল দেখিয়ে, কূপ দেখিয়ে ক্ষেপাসনে, আমিও কিছু বলব না। চুপ কর, চুপ কর!

এই সান্ত্বনায় প্রীত হইয়া মিনু অশ্রুজলের ভিতর দিয়াই হাসিয়া উঠিল। বলিল—তবে আমায় একটা গোলাপ তুলে দেও।

ছোট ছোট ঝোপ গাছে টকটকে লাল গোলাপ ফুল গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়া ছিল। লোকটি বাধ্য শিশুর মতো এক থোলো কুঁড়ি ও ফুটন্ত গোলাপ তুলিয়া মিনুর হাতে দিল। মিনু সেই ফুলের তোড়াটি বুকের উপর জামার গায়ে গুঁজিয়া দিল। মিনু হাসিয়া হাততালি দিয়া বলিল—দেখ দেখ কেমন সুন্দর!

লোকটির মুখ পাংশু বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ডোঙার মতো বড় দুখানা হাতে তার প্রকাণ্ড মুখ ঢাকিয়া আহত পশুর মতো কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়া উঠিল—ওরে ওরে তোর বুকের ওপর ওযে রক্তের মতো লাল—ফ্যাল, ফ্যাল, টেনে ফ্যাল, আমায় আর লোভ দেখিয়ে ক্ষেপাসনে।

মিনু ভয় পাইয়া ফুলগুলি খুলিয়া ফেলিল। আবার তাহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

লোকটি চোখ খুলিয়া বলিল—ছি! তুই আবার কাঁদচিস। চুপ কর চুপ কর। আমায় তুই ক্ষেপাসনে, আমিও তোকে কাঁদাব না।

সে তার হাতুড়ির মতন হাতখানা দিয়া মিনুর অশ্রু মুছাইয়া তাহার গালে আদর করিল। সে নত হইয়া মিনুকে চুমু খাইতে যাইতেছিল, এমন সময় বাহিরে অনেক লোকের ব্যস্ত কোলাহল, দৌড়াদৌড়ি শুনা গেল।

ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতন লোকটা তড়াক করিয়া সোজা হইয়া উঠিল। তারপর এক লাফে বাগানের এক কোণে গিয়া লুক্কায়িত হইল।

বাহির হইতে কে কপাটে ঘা দিয়া ব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিল —মিনু, তুই কোথায়?

—বাবা, আমি এখানে।

—খোল্ খোল্, দরজা খোল।

—দরজায় যে খিল দেওয়া।

—আরে খিলই খোল না।

—খিল যে উঁচুতে, আমি নাগাল পাই না।

—তবে দিলি কেমন করে?

—আমি দিয়েছি বুঝি—খিল তো ও দিলে।

বাহির হইতে ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন হইল—ও কে রে?

মিনু বলিল—ও একজন কয়েদি, আমি ওর নাম জানিনে।

বাগানের কোণ হইতে একটা দুঃখবিরক্তি-মিশ্রিত হতাশার শব্দ মিনুর কানে গেল। ফিরিয়া দেখিল কয়েদি সামনের দিকে হেলিয়া গুঁতাইতে-উদ্যত গোরুর ভঙ্গিতে কোদাল উঁচাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মিনু তাহার সেই ভাব দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—না না, তুমি অমন করে থেকো না—ওগো তুমি আবার ক্ষেপে উঠলে কেন?

এতক্ষণে বাহির হইতে দরজা ভাঙিবার জন্য খুব চেষ্টা হইতেছিল। মিনু ছুটিয়া কয়েদির কাছে গিয়া তাহার কোর্ত্তা ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—এস লক্ষীটি, দরজা খুলে দেও—ওরা যে দরজা ভেঙে ফেললে! তুমি কোদাল ফেলে দেও, নইলে আমি আবার কাঁদব!

কয়েদি মিনুর মিনতিভরা চোখের দিকে চাহিয়া দেখিল—দুটি বিন্দু অশ্রু, তরল মুক্তার মতন টলটল করিতেছে। কয়েদি সটান

হইয়া দাঁড়াইয়া মৃত্যুনিশ্চিত পশুর মতো কাতর শব্দে নিশ্বাস ফেলিয়া কোদাল ফেলিয়া দিল। তাহার প্রকাণ্ড হাপরের মতো সেই চৌড়া বুকখানার মধ্যে যে বিষম তোলপাড় হইতেছিল তাহাতে যেন তাহার বুকখানা এখনি ফাটিয়া যাইবে। মিনু কিন্তু তাহাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো টানিয়া দরজার কাছে আনিয়া বলিল—দরজাটা খুলে দাও।

কয়েদি একবার খিলের দিকে চাহিল, একবার মিনুর মিনতি-ভরা চোখের দিকে চাহিল, একমুহূর্ত্ত মাত্র ইতস্তত করিল, তারপর সে দরজার খিল খসাইয়া দিয়া স্তব্ধভাবে মিনুর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দরজা খোলা পাইয়া তিনজন পাহারাওয়ালা বাঁধভাঙা জলের মতো ছুটিয়া বাগানে ঢুকিয়া কয়েদিকে ধরিল। সেই কয়েদি, বন্দী বাঘের মতো, আপনার বলের গর্ব্বে দৃপ্তভাবে শুধু দাঁড়াইয়া রহিল, কোনো বাধাই দিল না।

জেল-দারোগা তাড়াতাড়ি আসিয়া কন্যাকে বুকে তুলিয়া চাপিয়া ধরিল, যেন সে হারানো রত্ন ফিরিয়া পাইল।

পাহারাওয়ালারা কয়েদিকে লাথি কিল চড় ধাক্কা গুঁতো মারিতে মারিতে জেলখানায় লইয়া যাইতেছে দেখিয়া মিনু চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—বাবা, বাবা, ওকে মারতে বারণ কর।

জেল-দারোগা কন্যাকে বুকে চাপিয়া বলিল—ওর জন্যে কাঁদিস্‌নে, ও খুনে ডাকাত!

এ কথাতে মিনু কিন্তু কোনো সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইল না।

স্ত্রীচরিত্র

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীশ্রীসঙ্ঘপাল মুমুক্ষু মহাশয় শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

মতিমন্, আমি বিপদে পড়িয়া আপনার শরণাপন্ন হইতেছি, কৃপা করিয়া রক্ষা করুন।

আপনি বোধহয় জানেন, ওদন্তপুরীর রত্নাকর শ্রেষ্ঠীর কন্যা সুমিতার পাণিপ্রার্থী ছিলাম আমি। রমণীর জটিল মনস্তত্ত্বানভিজ্ঞ আমার সামান্য নির্বুদ্ধিতায় আমি তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছি। ওঃ কি মনস্তাপ!

আপনি সুমিতাকে বাল্যাবধি জানেন,—অর্থাৎ আপনি অন্ততঃ মনে করেন যে আপনি তাহাকে জানেন। কিন্তু হায়, রমণীচরিত্র নিতান্তই দুর্জ্ঞেয়। তাহাদের মতি, গতি, চিন্তাপ্রণালী, আচার ব্যবহার সবই পুরুষের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়, চমৎকার, বিস্ময়কর। তাহাদের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি কিসে যে হয়, তাহা বলা দুঃসাধ্য। দুঃসাধ্য বলিয়াই আমার আজ এই বিপদ। হায়!

আমি সুমিতার শৈশবসঙ্গী। তাহার মনস্তত্ত্ব নিপুণতার সহিত অবগত হইয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল; কিন্তু এখন আমার ভ্রান্তি উপলব্ধি করিতেছি। ওদন্তপুরীর ভিক্ষুসঙ্ঘের ধর্ম্ম-প্রভাবে সে আশৈশব পূতশীলা, ধর্ম্মিষ্ঠা। সে ধর্ম্মের নামে পাগল হয়; প্রভু তথাগত বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ আলোচনায় তাহার চিত্তটি বায়ুমুখে শুষ্কপত্রের মতো লঘুভাবে নৃত্য করিতে থাকে। তাহার রুষ্টি তুষ্টি ক্ষণে ক্ষণে; কত দিন তাহার নিগ্রহ ও পুরস্কার ভোগ করিয়াছি, কিন্তু এইবারকার মতো স্থায়ী ক্রোধ তাহার আর কখনো দেখি নাই। হায় অদৃষ্ট!

আমি তাহাকে আমার প্রাণের মতন ভালোবাসিতাম, এখনও বাসি। সেও যেন ভালোবাসিত বোধ হইত; কিন্তু কেন এমন হইল! অত ভালোবাসা এক নিমেষে কেমন করিয়া নষ্ট হইয়া গেল!

গত বৈশাখীপূর্ণিমার দিন কার্য্যব্যপদেশে আমার শ্রাবস্তিপুরীতে যাওয়া আবশ্যক হয়। আমি বিদেশ যাত্রার পূর্ব্বে সুমিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। আমার বিদেশ যাত্রার কথা শুনিয়া তাহার সেই আয়ত চক্ষুদুটি অশ্রুভারে অবনত হইয়া পড়িল, —সে নীরবে আমার হাতখানি ধরিল। আহা, সে স্পর্শে কি ব্যাকুলতা, কি স্নেহ ব্যক্ত করিয়া দিল; কি মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করিল! অহো, সেই মদির-স্পর্শ!

আমি সত্বর প্রত্যাবর্ত্তনের আশা দিয়া তাহার চক্ষুজল মুছাইয়া দিলাম। তখন সে বলিল,—'তুমি নগরে যাইতেছ; নিদর্শনস্বরূপ আমার জন্য কিছু আনিয়ো।'

আমি বলিলাম,—'কি আনিব বল?'

সে হাসিয়া বলিল,—'আমি কি বলিব? আমার মনোমত যাহা হয় কিছু আনিয়ো। আমি তোমার বিচারক্ষমতা পরীক্ষা করিব।' এই অনুরোধ আমার কাল হইয়াছে!

আমি শ্রাবস্তিপুরী যাত্রা করিলাম। আমি কয়েকদিন কার্য্যে এমন ব্যস্ত ছিলাম যে সুমিতার অনুরোধ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। পথে আসিয়া মনে পড়িল। নিরুপায়। দুঃখিতমনে চিন্তিত হইলাম। সহসা একটা মতলব মনে পড়িল—কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম। হায় ভ্রান্ত আশ্বাস! আমাকে

গৃহে ফিরিয়া সুমিতাকে দেখিতে গেলাম। সুতামায় আনিতে

শিশিরসিক্ত ফুলটির মতো কাঁদিয়া হাসিয়া আমার হাত ধরিল। আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল,—'দেখি কি আনিয়াছ ?'

আমি মুখখানা নিতান্ত অপ্রতিভের মতো করিয়া বলিলাম,—'ঐ যাঃ, ভুলিয়া গিয়াছি।' সে এ কথা বিশ্বাস করিল না।

সে হাসিয়া বলিল,—'প্রেমিক প্রেমাস্পদের অনুরোধ স্মরণ রাখে না, ইহা অসম্ভব।'

আমি মনে মনে লজ্জিত হইয়া আমার ত্রুটি স্বীকার করিলাম, তবু সে আমায় বিশ্বাস করিল না। তাহার ব্যগ্র দৃষ্টি আমার উত্তরীয়-অন্তরালে যাহা হয় একটা কিছু আবিষ্কার করিবার জন্য উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। তাহার কৌতূহল ও আগ্রহ লইয়া আমি খেলা করিতে লাগিলাম—তাহার কাকুতি মিনতি, অনুনয় বিনয় পরম পরিতোষের সহিত উপভোগ করিতে লাগিলাম। যখন তাহার উচ্ছ্বসিত কৌতূহল অশ্রুবিন্দুরূপে পক্ষ্মপ্রান্তে কম্পমান দেখিলাম, তখন আমি একটি গজদন্তখচিত চন্দনকাষ্ঠের ক্ষুদ্র পেটিকা তাহার হস্তে দিলাম। সুমিতার কুতূহলী চক্ষু পেটিকার মধ্যে একটি ছিন্ন নখ দেখিয়া দীপ্ত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া নীরব প্রশ্ন করিল—'এ কি ?'

আমি মিথ্যাবাদী, তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া বলিলাম,—'উহা ভগবান বুদ্ধদেবের পদনখকণা।'

দৃঢ়ভক্তিভরে পেটিকাটি মস্তকে স্পর্শ করিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া সুখাবেশে সুমিতা বিহ্বলা হইল। আমি আমার শঠতার কষ্ট লজ্জায় মরিয়া গেলাম। হায় ধর্ম্মহীন নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা! করিয়াছি, ক্লিষ্ট মুখভাব দেখিয়া বিশ্বাসপরায়ণা সরলারও বুঝি কখনো দেখি নাই, তাই সুমিতা আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা

করিল,—'একি যথার্থ ভগবানের পদনখ? এ দুর্লভ সামগ্রী তুমি কেমন করিয়া পাইলে?'

আমি ধূর্ত্তের মতো, এদিক ওদিক তাকাইয়া চুপি চুপি বলিলাম,—'মহারাজ বিম্বিসারের স্তূপ হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছি।' হায়, আমি অনাচারী, অধার্ম্মিক; শঠতা করিয়া আমারই পদনখ ভগবানের নামে চালাইয়া দিয়া, সরলা বালিকার ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রতি কৃতঘ্নতা করিয়াছি।

সরলা সুমিতা তাহার আয়ত চক্ষু কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া শুধু নীরবে আমার দিকে চাহিল; আমার হাতখানি ধরিয়া তাহার অনাড়ম্বর স্নেহ সবটুকু নিঃশেষে যেন আমার পূজায় নিয়োজিত করিয়া দিল। হায় অপাত্রে বিশ্বাস! হায় অপূজ্যের পূজা!

ক্ষণেক পরে আনন্দসংবৃতা সুমিতা প্রশ্ন করিল,—'মহারাজের স্তূপ হইতে চুরি করিলে কেমন করিয়া?'

হায় মিথ্যা কথা! একবার একটা বলিলে আর নিস্তার নাই; রক্তবীজ রাক্ষসের মতো তার উদ্ভব নিবারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমি মিথ্যাকে মিথ্যার আবরণ দিয়া বলিলাম,—'রাজরক্ষীদের সহস্রমুদ্রা ও ধর্ম্মপাল পুরোহিতকে দশসহস্র সুবর্ণমুদ্রা উৎকোচ দিয়া, ভগবান বুদ্ধের দন্ত কেশ ও নখের মধ্যে ভগবানের পাদনখই তোমার অধিক প্রিয় হইবে বলিয়া, পাদনখ চুরি করারই প্রবৃত্তি আমার হইয়াছিল।' আমার মিথ্যাবাণী শতদলের মতো হাসিতে লাগিল;—সে হাসিতে আমি দেখিলাম বিদ্রূপ, সুমিতা দেখিল প্রেমের প্রতিষ্ঠা!

সুমিতা হর্ষগদ্‌গদ হইয়া বলিল,—'তুমি যথার্থই আমাকে ভালোবাস, নতুবা এমন মনোমত দুর্লভ সামগ্রী তোমায় আনিতে

প্রবৃত্তি দিল কে ? তোমার প্রেম মন্নিষ্ঠ মন্ময়। প্রেম অন্তর্যামী !'
এই বলিয়া তাহার ক্ষুদ্র মস্তকটি আমার স্কন্ধে ন্যস্ত করিল। হায় সেই
স্পর্শ, সেই ঘ্রাণ আজও তেমনি নূতন মনে হইতেছে ! কিন্তু দুর্ভাগ্য
আমার সেই প্রথম দিনই শেষ দিন হইয়া গেল ! আবেশেই তন্দ্রা
টুটিয়া গেল !

আমি এই চুরির কথা গোপন রাখিতে অনুরোধ করিলাম ;
প্রকাশ পাইলে আমার প্রাণসংশয় ইহাও তাহাকে বেশ করিয়া
বুঝাইয়া দিলাম। আবার প্রতারণা !

দুদিন পরেই রত্নাকর শ্রেষ্ঠী শ্রাবস্তিপুরী যাত্রা করিলেন।
আমার অজ্ঞাতসারে সঙ্গে গেল সুমিতা।

বলিতে লজ্জা করিতেছে,—আমি ধর্ম্মের বড় একটা ধার ধারিতাম না। শ্রাবস্তিপুরীতে গিয়াছিলাম কার্য্যের জন্য ; আমি মহারাজ
বিম্বিসারের রচিত স্তূপ চক্ষেও দেখি নাই। আমি সেই স্তূপের
একটা কাল্পনিক বর্ণনা দিয়া, আমারই পাদনখ ভগবানের নামে
চালাইয়া দিয়াছিলাম। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে সুমিতা কখনো
এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া নগর দর্শনে যাইবে। প্রেমের জন্য যে
মন্দিরে আমি পবিত্র-পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলাম বলিয়া তাহার যে
ধারণা হইয়াছিল, তাহারই বলবৎ আকর্ষণ তাহাকে সেই স্থান
দেখিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিল বোধ হয়।

সুমিতার নগরগমনসংবাদে আমি ভীত হইলাম। কয়েক দিন
পরেই দেখিলাম আমার ভয় নিরর্থক নয়। সুমিতার পত্র
পাইলাম—

'ভদ্র,

আপনার সহিত আমার বিবাহবন্ধন অসম্ভব। যেখানে শঠতা,

প্রতারণা, সেখানে প্রেমের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আপনার পেটিকা প্রত্যর্পণ করিলাম—শঠতার জয়চিহ্ন আপনারই। আমার সাক্ষাৎ-কামনা করিবেন না; করিলেও সফলমনোরথ হইবেন না। ইতি—

প্রতারিতা সুমিতা।'

'ভদ্র' সম্বোধনে তাহার গূঢ় তিরস্কার অনুভব করিয়া লজ্জিত হইলাম।

হায় দুর্জ্ঞেয় রমণীর চরিত্র! আমি সুমিতার আদর অনুরাগ অধিক পাইয়াছিলাম, যখন সে আমাকে পবিত্রমন্দির-অপবিত্রকারী চোর বলিয়া জানিয়াছিল; আর, আজ আমি তাহার সঙ্গবঞ্চিত, স্নেহচ্যুত, কারণ আমি চোর নহি,—বহুলোকের আরাধ্যবস্তু আমার নিজের স্বার্থের জন্য আমি চুরি করি নাই। হায়—

'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ'।

আমার অনুনয়, বিনয় ও কাতরপ্রার্থনা সব ব্যর্থ হইল। ধর্ম্মিষ্ঠার ক্ষুব্ধ চিত্ত আমার অনুনয়ে কোমল আর্দ্র কিছুতেই হইলনা। তাহার গৃহে আমার প্রবেশ পর্য্যন্ত নিষেধ। হায়, কি করিতে এ কি হইল!

আমি ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায়, বিরহে ক্লিষ্ট হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছি।

বোধ হয় ইহা জ্ঞাত হইয়াই সুমিতার সখী আনন্দমিত্রের কন্যা সুজাতা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। যে সর্ত্তে সুমিতা আমাকে ক্ষমা করিয়া পুনর্গ্রহণ করিতে পারেন তাহা আমাকে বলিয়া গিয়াছেন।

আমাকে ভগবান তথাগতের কোনো চিহ্ন সংগ্রহ করিয়া দিতে

হইবে, এবং সে চিহ্ন বৌদ্ধমহাসমিতির দ্বারা অকাট্যপ্রমাণে প্রশংসিত করাইতে হইবে। যদি পারি তবেই আমার রক্ষা নতুবা আমি গেছি।

আমি চিন্তা মনস্তাপে পাগল হইব বোধ হয়। আপনি কি আমাকে এ বিপদে সাহায্য করিয়া প্রাণদান করিতে পারেন না? আশা করি আপনি দয়া করিয়া চেষ্টা করিবেন। আমিও সিংহল, চীন, তিব্বতে ভগবানের কোনো চিহ্ন সংগ্রহের জন্য যাত্রা করিব। সুমিতার জন্য অর্থনাশ ও ক্লেশ আমি গ্রাহ্য করি না। অর্থব্যয় ও ক্লেশ সহ্য করিয়াও সুমিতাকে পাইব কি!

আমার শঠতার অতিরিক্ত দণ্ড আমি ভোগ করিতেছি। আপনি আমায় মার্জ্জনা করিয়া উপায় নির্দ্দেশ করিবেন। মহারাজ বিম্বিসার নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহারাজ অজাতশত্রু তথাগত বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম্মে আস্থাবান নহেন শুনিতেছি। তিনি নাকি স্তূপে পূজানিষেধ করিয়াছেন। যদি স্তূপ নষ্ট করা হয়, আপনি কি ভগবানের পদ-নখ-কণা সংগ্রহ করিয়া আমাকে দিতে পারেন না? আপনার উপদেশপ্রতীক্ষায় জীবিত রহিলাম। সতত আপনার চরণধূলার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী। নিবেদন ইতি—

প্রণত হতভাগ্য বজ্রসেন।"

কুড়ুনি

আমার বয়স যখন ত্রিশ বৎসর তখন আমার একটি বন্ধু লাভ হইয়াছিল, যাহার বয়স তখন চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে। এই বয়স-তারতম্যে আমাদের হৃদ্যতা ও আত্মীয়তার কোনো ব্যাঘাত হয় নাই। আমরা বেশ সমবয়সী বাল্যবন্ধুর মতোই উভয়ের কাছে প্রাণের পৃষ্ঠা উন্মুক্ত করিয়া ধরিতে পারিতাম। আমরা উভয়ে উভয়কে কতকটা চিনিলেও, উভয় পরিবারের অনেকেই আমাদের অপরিচিত ছিলেন। তাই যখন আমার বন্ধুর বাড়ীতে পৌষ-পার্ব্বণে পিষ্টক ধ্বংসের নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম, তখন আমার কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হইয়াছিল।

বন্ধুর পরিবারসংখ্যা বেশি ছিল না। পুরুষের মধ্যে একমাত্র তিনি, এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৪।৫ জনের অধিক নহে। আমি বন্ধুর বাড়ী যাইতেই তিনি আমাকে একেবারে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন; সেখানে পাঁচজন স্ত্রীলোক আমার অপেক্ষা করিতেছিলেন। বন্ধু একে একে তাঁহাদের সকলের পরিচয় দিতে লাগিলেন,—"ইনি আমার দিদি, ইনি ভগ্নী; ইনি রসিকা শ্যালিকা, ইনি আমার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী, প্রবলপ্রতাপান্বিতা পত্নী শ্রীমতী যোগমায়া ঠাকুরাণী।" তৎপরে পঞ্চমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"কুড়ুনি, তোমার কি পরিচয় দিব?" কুড়ুনির শ্বেতশতদলের মতো সরল সুন্দর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল, তিনি মুখ নত করিলেন। ডাগর চোখ দুটি লজ্জা সংবরণের বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। বন্ধু তখন আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"ইনি শ্রীমতী কুড়ুনি, আমার গৃহের কর্ত্রী, সংসারের

সেবিকা, আমার গৃহিণীর দক্ষিণ হস্ত, এককথায় ইনি আমাদের গৃহদেবী।” সকলে খুব হাসিলেন, আমি কিছু না বুঝিয়াই হাসিলাম, কুড়ুনি লজ্জায় কাতর হইয়া উঠিলেন।

যখন আমরা দুই বন্ধু অন্য ঘরে গেলাম, তখন আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—“রাজীব (আমার বন্ধুর নাম শ্রীমান্ রাজীবলোচন লাহিড়ী), ঐ কুড়ুনি মেয়েটি বাস্তবিক কে ?”

রাজীব বলিলেন,—“তোমায় কি কুড়ুনি-কাহিনী বলি নাই ?”

আমি আরো কুতূহলী হইয়া বলিলাম “না।”

“তবে শোন” বলিয়া রাজীব বলিতে আরম্ভ করিলেন।

“আমার পিতা ও নীলাম্বর রায় বড় ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে উভয়ে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া উভয় পরিবারকে বন্ধুপ্রীতিবন্ধনের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠতর বন্ধনে আবদ্ধ করিবেন। আমাদের বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে গর্ভস্থ ভ্রূণের ভবিষ্যৎ বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকে; কিন্তু আমার পিতা ও পিতৃবন্ধুর কোনো সন্তানসম্ভাবনার পূর্ব্বেই তাঁহারা বৈবাহিক হইয়া বসিয়াছিলেন। যাহা বিলম্ব সন্তানের। কিছুদিন পরে আমার জন্ম হয়; আমি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র; নীলাম্বর বাবু তখনো নিঃসন্তান। অতএব ভাবীকালে আমিই নীলাম্বর বাবুর জামাতৃপদে বৃত হইব স্থির হইয়া রহিল।

“নীলাম্বর বাবুর ক্রমাগত পুত্র জন্মিতে লাগিল, কন্যা আর হয় না। তখন অগত্যা আমার ভগ্নী নীলাম্বর বাবুর পুত্রবধূরূপে চিহ্নিত হইল, জামাতৃবরণের টীকা আমার ললাট উজ্জ্বল করিবার কোনো সম্ভাবনা ঘটিল না দেখিয়া নীলাম্বর বাবু বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইলেন। অবশেষে আমার বয়স যখন বারো বৎসর তখন তাঁহার এক কন্যা জন্মিল,

তাহার নাম যোগমায়া। যোগমায়া যখন ৫।৬ বৎসরের হইল, তখন হইতেই সে আমাদের গৃহে অধিকাংশ সময় যাপন করিত; সে যেন তখন হইতেই আমাদের পরিবারের একজন হইয়া গেল; স্থির হইয়াছিল তাহার নবমবর্ষে আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে, এবং ততদিনে আমি বি-এ, পাশ করিয়া পাঠ-সাঙ্গ করিতে পারিব।

"যোগমায়ার সহিত আমার বিবাহসম্বন্ধ স্থির ছিল বলিয়া যোগমায়ার প্রতি আমার কেমন একটা মমতা জন্মিয়াছিল; কিন্তু তাহাকে দেখিলে আমার বড় লজ্জা বোধ হইত; অধিকন্তু সে যখন আমাকে 'রাজীব দাদা' বলিয়া ডাকিয়া, আমার ঘাড়ে পিঠে চড়িয়া, হাসিয়া বকিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত আর দুই বাড়ীর লোক তাহা লইয়া রঙ্গতামসা করিত, তখন আমার নাক মুখ চোক দিয়া এমন আগুন ছুটিত যেন জ্বর হইয়াছে। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

"আমি এফ-এ, পাশ করার পর বাবা সপরিবারে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদর্শনে গিয়াছিলেন; যোগমায়া সঙ্গেই ছিল। পথে এক চটিতে বাবা একটি মেয়ে দেখিতে পান; বাঙালীর মেয়ে, বয়স ৭।৮ বৎসর মাত্র; সে নিজের কোনই পরিচয় দিতে পারে নাই,—কেবল তীর্থপথে তাহার পিতামাতা উভয়েই গতাসু হইয়াছেন, সে এখন নিরাশ্রয় এবং সে ব্রাহ্মণকন্যা, তাহার অসংলগ্ন কথা হইতে এইটুকু অতিকষ্টে আমরা সংগ্রহ করিতে পারিলাম। তাহার নাম সে বলিল 'মলিনা'।

"বাবা তাহাকে সঙ্গে লইয়া পরিবারভুক্ত করিলেন; আমাদের বাড়ীতে তাহার নাম হইল 'কুড়ুনি'। কুড়ুনির আর্য্যোচিত শ্রী,

তাহার নম্রতা, বাধ্যতা ও মিষ্টভাষিতা তাহাকে সৎকুলোদ্ভবা বলিয়াই প্রচার করিত। তাহার হরিণীর মতো ডাগর চোখের সরল দৃষ্টি এবং সকলের প্রতি যত্ন ও প্রীতি তাহাকে অল্পদিনের মধ্যেই সকলের প্রিয় করিয়া তুলিল। আমার পড়িবার সময় যোগমায়া বিরক্ত করিত, কুড়ুনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। যোগমায়া কুড়ুনি অপেক্ষা ৩।৪ বৎসরের ছোট, তবু সে সেই ডাগর সরল মেয়েটিকে দিব্য অসঙ্কোচে হুকুম করিত, কুড়ুনি ভয়ে ভয়ে সকল হুকুম তামিল করিত, এবং যোগমায়ার মনের মতন না হইলে সে মার খাইত, আর জলভরা চকিত চাহনিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিত কেহ সে নিগ্রহ দেখিল কি না। আমি কোনো দিন অত্যাচারিতার পক্ষ হইয়া যোগমায়াকে কিছু বলিলে বালিকার আয়ত লোচনের দীর্ঘপক্ষ্মপংক্তি কম্পমান জলবিন্দুগুলি আর ধরিয়া রাখিতে পারিত না। বালিকা যেন অনুভব করিত সে পরের গলগ্রহ, সে পরের করুণাশ্রিত। তাই কাহারো এতটুকু স্নেহ, একটি ভালো কথা তাহার প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতার কারণ হইত; বৃষ্টির পরে গাছ যেমন জলকণাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, একটু নাড়া পাইলেই ঝর ঝর করিয়া অযুত বিন্দুতে ঝরিয়া পড়ে, তেমনি অভিমানিনী পিতৃমাতৃ-হীনার জলভারাবনত পক্ষ্মপংক্তি করুণার একটু আঘাতে অকস্মাৎ জলবর্ষণ করিত। যোগমায়া সময়ে সময়ে কুড়ুনির প্রতি দুর্ব্যবহার করিলেও তাহাকে যথেষ্ট ভালোও বাসিত, কুড়ুনিকে না পাইলে তাহার খেলা জমিত না।

"যোগমায়ার অষ্টমবর্ষে আমার পিতার মৃত্যু হইল। তাহার নবমবর্ষে নীলাম্বর বাবু গৌরীদানের ফলাধিকারী হইবার জন্য আমায় বিশেষ তাগাদা আরম্ভ করিলেন। কালাশৌচ ও বি-এল,

পরীক্ষার ওজর করিয়া বিবাহটা আরো দু'বৎসর স্থগিত রাখিলাম। যোগমায়া যখন একাদশবর্ষে উপনীত হইল তখন আমি ওকালতি আরম্ভ করিয়াছি। উপার্জ্জনক্ষম হওয়া প্রভৃতি যতগুলি মামুলি আপত্তি আছে তাহারা সকলেই যখন একে একে জবাব দিল তখন অগত্যা আমার বিবাহের দিনস্থির করিবার ধুম লাগিয়া গেল।

"আমি একদিন কুড়ুনিকে বলিলাম, 'কুড়ুনি, তোমারো একটা বিবাহ হওয়া উচিত। বল তো জোগাড় দেখি।'

"কুড়ুনি লজ্জাবিনম্র স্বরে বলিল, 'যাকে কেউ চেনে না জানে না তাকে কে বিবাহ করবে?'

"আমি অনেকক্ষণ কোন উত্তর করিতে পারিলাম না। আমি ইজি-চেয়ারে শুইয়া তখন পড়িতেছিলাম 'কোন পাড়ে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী, হে সুন্দরী!' রবির কাব্যের একটা রহস্যময় আভাস সন্ধ্যার সুদূর মেঘমালা ও উদ্যানের পুষ্পগন্ধের মধ্য হইতে ক্ষরিত হইতেছিল, সেদিকে আমার শূন্যচিত্ত কিছুই লক্ষ্য করিতেছিল না। কাব্যগ্রন্থখানা নিজের বুকের মধ্যে আমার মোটা আঙুলটা চাপিয়া ধরিয়া আমার কোলে বিস্মৃতি ও উপেক্ষা ভোগ করিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে আমি বলিলাম, 'দেখ, যাঁহারা জাতিধর্ম্মের মুখাপেক্ষী নহেন, যাঁহারা ব্যক্তিগত গুণের মর্য্যাদাই প্রধান বলিয়া মানেন, এমন সমাজ তোমায় আদর করিয়া গ্রহণ করিবেন। তুমি বল তো আমি চেষ্টা করি।' কুড়ুনি তাহার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আমার মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, 'আমি কি আপনাদের ভার হয়েছি, দাদাবাবু?' আর আমি কথা কহিতে পারিলাম না; রজনীর অন্ধকার আমাদিগকে আবৃত করিয়া অসুখকর কথোপকথনের লজ্জা হইতে অব্যাহতি দিল।

"যোগমায়ার সহিত আমার বিবাহ হইল। আমার মাতার মৃত্যু হইলে যোগমায়া সংসারের কর্ত্রী হইল; কুড়ুনি হইল তাহার সহচরী ও সহকারিণী। কুড়ুনি আমাদের সংসারে ভাণ্ডারী, সেবিকা, Guardian Angel."

রাজীবের গলা সহসা ভারি হইয়া গেল, রাজীবের বড় বিষম লাগিল, রাজীব এইখানেই গল্প শেষ করিল। আমি তখন বলিলাম,—"তুমি এখনো কুড়ুনিকে এত ভালোবাস!"

রাজীব বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "ভালোবাসি? কে বলিল? না, তাকে আমি যথেষ্ট স্নেহ করি বটে; তুমি তাহাকে চিনিলে তুমিও স্নেহ করিতে বাধ্য হইবে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ইংরাজীতে যাহাকে love বলে এ স্নেহটা তাহাই—তুমি কি আমার কাছে গোপন করিতে পারিবে? তুমি যদি কুড়ুনিকে খুব ভালো না বাসিতে, যদি তাহাকেই বিবাহ করিবার বাসনা তোমার মনে না উঠিত, তবে তুমি যোগমায়াকে বিবাহ করিতে অনর্থক অত বিলম্ব করিতে না; কুড়ুনিকে ভিন্ন-সমাজভুক্ত হইয়া বিবাহের প্রলোভন দেখাইতে না। আবাল্য একত্রাবাসের ফলে যৌবনে আসিয়া যোগমায়ার প্রীতি অনুরাগ তোমার নিকট বৈচিত্র্যবিহীন বলিয়া মনে হইয়াছিল বলিয়াই নবলব্ধ কুড়ুনির অনুরাগ তোমাকে অধিক আকর্ষণ করিয়াছিল। কুড়ুনি ভিন্নসমাজে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলে হয় তুমি নিজে বিবাহ করিতে, নয় তাহার অন্য সুপাত্রের সহিত বিবাহ দিয়া তুমি অনেকটা মুক্ত হইতে পারিতে। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি তুমি বহুবর্ষ কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছ; একদিকে পিতৃপণবদ্ধা যোগমায়ার প্রতি অনু-রাগ, অপরদিকে কুড়ুনির প্রতি গাঢ় ভালোবাসা তোমাকে কোনো

দিন বিশ্রাম দেয় নাই। তুমি প্রেয় ত্যাগ করিয়া শ্রেয় আশ্রয় করিয়াছ ইহা বীরের মতো কার্য্য হইয়াছে, কিন্তু সাংসারিক হিসাবে ঠিক করিয়াছ কি না ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

রাজীব কাঁদিয়া ফেলিল। সে বলিল, "ভাই, আজ ২৬।২৭ বৎসর যে বেদনা কাহাকেও জানিতে দি নাই, আজ তুমি তাহা জানিয়া ফেলিলে!"

রাজীবের রুদ্ধশোক মুক্ত হইয়া উদ্দাম হইয়া উঠিল, আর শান্ত হইতে চাহে না।

আমি কথায় ব্যাপৃত রাখিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার স্ত্রী এ বৃত্তান্ত জানেন?"

রাজীব বলিল, "না; তুমি আমি ও ভগবান ছাড়া আর কেহ আজও জানে নাই!"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কুড়ুনিও না?"

রাজীব বলিল, "না; দৃষ্টি, বাক্য ও ব্যবহারে আমার প্রাণের আবেগ কখনো তাহার নিকট ধরা পড়িতে দি নাই; কেন সে আমার জন্য অনর্থক কষ্ট পাইবে? তাহার প্রাণটুকু সংসারের সুখদুঃখের আয়ত্তের বাহিরে, তাহার সুখও নাই, দুঃখও নাই; সে আপনাকে লইয়া আপনি বেশ আছে।"

আমি বলিলাম—"আ মূর্খ অন্ধ প্রেমিক, না, সে বেশ নাই; সেও তোমাকে খুব ভালো বাসে; তুমি যখন তাহাকে বিবাহ করিতে বলিয়াছিলে, তখন সে যে গূঢ় তিরস্কার করিয়াছিল তাহাই তাহার ত্বন্নিষ্ঠ প্রেমের পরিচায়ক, তুমি প্রেমান্ধ না হইলে বুঝিতে পারিতে সে তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও চাহে না। দুটি হৃদয় এত কাছাকাছি হইয়াও এমন আশ্চর্য্য রকমে অপরিচিত আছে, এমন

ভাবে আত্মগোপন করিতে পারিয়াছে, ইহা মনে করিতে আমার হৃদয় আনন্দরসাপ্লুত হইয়া উঠিতেছে। আমি আজ দুটি হৃদয়ের পরিচয়সাধন করিয়া দিয়া ধন্য হইব।"

"না, না, অমন কাজ করিয়ো না," বলিয়া রাজীব কাঁদিয়া আকুল হইল; দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ক্রন্দনাবেগ রোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; আঙুলের ফাঁক দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময় রাজীবের দিদি ডাকিলেন, "রাজীব তোরা আয়, খাবার দেওয়া হয়েছে।" রাজীবকে চুপ করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম; যত চোখ মুছাইয়া দি তত অশ্রুপ্রবাহ কপোল ম্লান করিয়া ছুটিয়া চলে। আমাদের বিলম্ব দেখিয়া রাজীবের দিদি ডাকিতে ডাকিতে আমাদের ঘরে আসিয়া উপস্থিত। রাজীবের মুখ চোখ ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে, আমি মহা বিপদেই পড়িলাম। তাড়াতাড়ি রাজীবের চোখে ফুঁ দিতে লাগিলাম; কাপড়ের পুঁটুলি ফুঁ দ্বারা গরম করিয়া চোখে সেক দিবার ছলে চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিলাম। রাজীবের দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?" আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "রাজীবের চোখে কি পড়েছে, ভয়ানক জ্বালা করছে। কি পড়েছে কিছু দেখা যাচ্ছে না।"

ক্রমে ক্রমে বাড়ীর সকলে সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে পালাক্রমে চোখ দেখিতে লাগিলেন, রাজীব বেচারার চোখ লইয়া টানাটানি পড়িয়া গেল। রাজীবের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখেও আমার হাসি আসিতেছিল! আমার বিকাশোন্মুখ হাসি নিভিয়া গেল, দ্বারোপান্তে ব্যগ্রতার স্থির প্রতিমূর্ত্তি কুড়ুনিকে দেখিয়া। মরি মরি! কোন্ নিপুণ ভাস্কর স্থির অচল পাষাণে

এমন ব্যগ্রতার ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছে! আমি আস্তে আস্তে কুড়ুনির পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম, তিনি কিছুই টের পাইলেন না, তাঁহার ব্যাকুলদৃষ্টি রাজীবের দিকে। আমি কথা বলিবার উপক্রম করিয়া একটু শব্দ করিতেই কুড়ুনি চমকিয়া উঠিয়া অপ্রতিভ ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়াই মুখ নত করিলেন। আমি তখন চুপি চুপি বলিলাম, "রাজীবের চোখে কিছু পড়েনি ও কাঁদছে।" কুড়ুনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "কেন?" আমি বলিলাম "আপনার জন্যে।" কুড়ুনি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন "আমার জন্যে?" আমি বলিলাম, "হাঁ আপনারই জন্যে; ২৬।২৭ বৎসর সে আপনাকে নীরবে যে ভালো বেসে এসেছে, তার আবরণ আজ আমি খুলে ফেলেছি। তাকে এও বুঝিয়ে দিয়েছি যে তার প্রেম ব্যর্থ হয়নি;—আপনিও তার প্রণয়ে এই দীর্ঘজীবন তপস্বিনীর মতো উৎসর্গ করে দিয়েছেন।"

কুড়ুনি ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন, বসিয়া আস্তে আস্তে শুইয়া পড়িলেন। আমি বুঝিলাম নিষ্কামসাধিকা সুধীরার চিত্ত, মিলনের পরিচয়ের সাফল্যের আনন্দাঘাত সহ্য করিতে পারিতেছে না। আমি রাজীবকে-লইয়া-ব্যস্ত সকলকে ডাকিয়া বলিলাম "এদিকে দেখুন, এর বোধ হয় মূর্চ্ছা হয়েছে।"

সকলে তখন কুড়ুনিকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, আমি সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া সরিয়া পড়িলাম। পৌষপার্ব্বণে পিষ্টক ধ্বংস করিতে না পারার যে দুঃখ, তাহা দুটি প্রেমিক হৃদয়ের পরিচয়-সাধনের সৌভাগ্যে আমার নিকট বড় ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল।

জীবন-নাট্য

পাকা আমের সময়। সে তখন বালক মাত্র। গিয়াছিল সে মামার বাড়ী বেড়াইতে। বাগানে আম কুড়াইতে গিয়া পাড়ার একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা। মেয়েটিও বালিকা। তাহাকে দেখিয়াই বালকের চিত্ত যেন বলিয়া উঠিল—এই এই, একেই আমি খুঁজিতেছিলাম, একেই আমি চাই।

কিন্তু সে বালক কিনা, মেয়েটিকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। শুধু অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, মেয়েটি রকম দেখিয়া একটু শুধু হাসিল।

এবার এই পর্য্যন্ত। বালক মামার বাড়ী হইতে চলিয়া গেল, কিন্তু সেই একদিনের-দেখা মেয়েটির সেই হাসিটুকু সে ভুলিল না।

আবার যখন সে মামার বাড়ী ফিরিল, তখন সে কলেজের ছেলে। তবু তখনো বালক। এবারও সেই মেয়েটির সঙ্গে পুকুর-ঘাটে দেখা। তার বয়স এখন চৌদ্দ বছর। কিন্তু তখনি তার বুকখানি মাতৃত্বের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। মেয়েটির আগেকার সেই চঞ্চল গতি মন্থর, ও স্থির দৃষ্টি বিচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে—সমস্ত দেহে একটি লাবণ্যময় লীলা পারদরাশির মতো টল টল করিতেছিল।

সে এবার আরো অবাক হইয়া মেয়েটিকে দেখিতে লাগিল; এবারও মেয়েটি তাহার রকম দেখিয়া হাসিল, কিন্তু তেমন সহজভাবে মুখের দিকে তাকাইয়া নয়—ঘাড় অন্যদিকে বাঁকাইয়া কিন্তু দৃষ্টিখানি তারই দিকে হানিয়া।

তাদের আলাপ হইতে দেরি হইল না, এবং আলাপ যদি হইল তো তাহার মধ্যে এমন কথাও হইল যাহা শুধু সেই দুইটি মুখেরই বলিবার মতো আর সেই চারটি কানেরই শুনিবার—আর কারো কাছে সে বলিবার নয়, আর কারো সে শুনিবারও নয়।

মেয়েটি বিধবা। তাকে বিয়ে করা অসাধ্যসাধন। কিন্তু সর্ব্বস্ব যেখানে বাঁধা পড়িয়াছে, প্রাণপণ করিয়াই তো সে-সব উদ্ধার করিতে হয়। ছেলেটি উপার্জ্জন করিবার জন্য আপনাকে প্রাণপণ যত্নে তৈরি করিতে লাগিল। সে ইঞ্জিনিয়ার হইবে—তার জন্যে অন্তত পক্ষে আট বছর দরকার। আট বচ্ছর!

ছেলেটি মাঝে মাঝে মামার বাড়ী আসে আর মেয়েটিকে দেখে—সে দিনে দিনে নব নব শ্রীতে পরিমণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে। এমনি আশায় আনন্দে বাধায় চুরিতে প্রণয় তাহাদের প্রগাঢ় হইতে লাগিল।

এমনি করিয়া তিন বছর কাটিয়া গেল। চতুর্থ বছরে মেয়েটির জ্বর-বিকার হইল।

তারপর ছেলেটি যখন তাহাকে দেখিল, তখন মেয়েটির রং বিবর্ণ, চোখ কোটরগত ও উদাস, মাথার চুল কাটা, সুগোল দেহের লাবণ্য কঙ্কালসার বিশ্রী। অমন রূপ হতশ্রী হওয়াতে ছেলেটির দুঃখ হইল, তবু তাহার অনুরাগের হ্রাস হইল না।

ক্রমে ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ার হইল। অর্থ প্রতিপত্তিও হইল। কত সুন্দরী কিশোরীর পিতা তাহাকে দুবেলা সাধ্যসাধনা করিতে লাগিল—কিন্তু সে সেই চোদ্দ বছরের মেয়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করা ভুলিল না। সে বিধবাকেই বিয়ে করিল।

মেয়েটির আবার চুল হইয়াছিল, কিন্তু তেমন ঘন লম্বা গোছ

বাঁধে নাই; তার চোখের কোল ভরিয়াছিল, কিন্তু দৃষ্টিতে সে চঞ্চল আবেশ ছিল না; রং ফিরিয়াছিল কিন্তু আগেকার সেই চৌদ্দ বছরের মেয়ের উচ্ছল লাবণ্য ফিরে নাই; হৃদয়ের অন্তরে প্রণয় জমাট বাঁধিয়াছিল, কিন্তু বাহিরের সেই উচ্ছ্বসিত শ্রী এখন শিথিল হইয়া গিয়াছিল। চৌদ্দ বছরের মেয়েকে ভালো বাসিয়া ছেলেটি বাইশ বছরের মেয়েকে বিবাহ করিল—তবু তাহাকে ভালো বাসিত।

ভালো বাসিত; কিন্তু আগেকার সেই ব্যগ্রতা আর ছিল না; অনাবশ্যক বকুনি থামিয়া গিয়াছিল; পলকে পলকে চাওয়াচাওয়ি ও চুরি করিয়া হাসাহাসি বিদায় লইয়াছিল; মুহূর্ত্ত অদর্শনে প্রলয়বোধ এখন ঘরকন্নার কাজের মাঝে ডুব দিয়াছিল।

ক্রমে ক্রমে দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে হইল। মেয়েটি বাপের প্রাণ, তার নয়নতারা, তার অনন্ত সান্ত্বনা।

মেয়েটি যত বড় হইতে লাগিল তত তার মধ্যে তার মায়ের অতীত ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল; আর তত সে বাপের হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। মেয়ের দশ বৎসর বয়সে তার মায়ের সেই চৌদ্দ বৎসরের ছবি বাপের চোখে নূতন হইয়া দেখা দিল।

বাপ সময় পাইলেই মেয়ের কাছটিতে লাগিয়া থাকিত; মেয়েকে যতটা পারে চোখে চোখে সে রাখে। মেয়েকে লইয়াই বাপ ব্যস্ত, মেয়ের মায়ের খবর লওয়া বড় একটা ঘটিয়া উঠিত না।

দুর্ব্বল শরীরে সন্তান প্রসব ও ঘরকন্নার খাটুনিতে মায়ের শরীর ভাঙিয়া গিয়াছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কাজে ব্যস্ত, দেখা সাক্ষাৎ বড় একটা ঘটিত না। তবু ভালোবাসা ছিল। কিন্তু যেমনটি ছিল তেমন কি? ॥

একদিন প্রভাতে মেয়েটি বিছানা হইতে উঠিল না। মা বলিল — স্কুলে না যাইবার ছুতো। বাবা কিন্তু তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিল।

মৃত্যুর দূত মেয়েটিকে ডাক দিয়াছে—মেয়েটির যক্ষ্মা হইয়াছে। মা ঘরকন্না লইয়া ব্যস্ত। বাবা তাহার শুশ্রূষার জন্য আহার নিদ্রা কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিল। অর্থে শ্রমে চেষ্টা যত্নে যত রকম আরাম দিতে পারা যায় মেয়েটির কিছুরই অভাব রহিল না। বাপের সঙ্গে সে যখন কথা কহিত বাপের বুক দুঃখবেদনায় ভরিয়া উঠিত; তবু সে নিজের কষ্ট চাপিয়া রাখিয়া মেয়েকে হাসাইতে চেষ্টা করিত।

একদিন আর মেয়েটি হাসিল না, কথাও বলিল না। সব শেষ হইয়া গেল!

সে শোকের দৃশ্য চিত্র করা অসম্ভব। যখন লোকে মৃতদেহ লইতে আসিল, তখন বাপ একেবারে ক্ষেপিয়া গেল—লোককে মারিতে যায়—অমন দুধের মেয়ে মরিয়া গেছে এ সে বিশ্বাসই করিতে পারে না, এখনো আশা থাকিতে পারে, সে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে।

লোকেরা তাহার মিনতি শুনিল না, বাধা অগ্রাহ্য করিল, অমন সোনার মেয়েকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিল।

পাগল পিতা এক মুঠি ছাইয়ের উপর সমাধি রচনা করিল। শাদা পাথরের সুন্দর সমাধি। রোজ সে একগাছি শাদা সুগন্ধি মালা পরাইয়া সমাধির কাছে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া আসিত।

এমনিভাবে বছরখানেক গেল। দ্বিতীয় বৎসরে কন্যার সমাধির কাছে নিত্য আর শোক করার সময় হয় না, কাজের

বড় ঝঞ্ঝাট। মনে মনে একএকবার লজ্জা হয় যে মেয়ের প্রতি ঠিক মতো স্নেহ প্রকাশ করা হইতেছে না। তবু সময় বড় চিকিৎসক,—সকল শোক, সকল লজ্জা, সকল স্মৃতি সে অল্পে অল্পে অলক্ষ্যে মুছিয়া ফেলিতে লাগিল।

আরো দুটি কন্যা জন্মিয়াছে—কিন্তু তারা তাহার মতো নয়, এ কথা তার বাপের মনে জাগে।

আর স্ত্রী? যার তুল্য নারী এ জগতে আর ছিল না, এখন তার সে মোহিনী ঘুচিয়া গেছে, বিশুষ্কমঞ্জরী লতার মতো একদিনের যা শ্রী এখন নষ্ট হইয়া তাহাই তাহাকে অধিকতর কুশ্রী করিয়া তুলিয়াছে।

জীবনেরও স্ফূর্তি আনন্দে ভাটা ধরিয়াছে। বার্দ্ধক্য চুপি চুপি ঘাড় ধরিয়া পিট কুঁজা করিয়া দিতেছে, পা বাঁকা ও কম্পিত করিয়া তুলিতেছে।

ঘরকন্নারও সে শ্রী নাই। একা গিন্নি অনেকগুলি ছেলেপুলে সামলাইতে পারে না। তাহারা চেয়ারের ঠ্যাং ভাঙে, বালিসের তুলো বাহির করে, চূনকাম করা দেয়ালে কালি ছড়ায়, গানের বদলে ছেলেদের কান্না গৃহখানিকে ভরিয়া রাখে। কাজেই কর্ত্তা-গিন্নির মেজাজ চটা, কথা কড়া, ব্যবহার রূঢ় হইয়া উঠিতেছে। কর্ত্তা-গিন্নিও এখন ছাড়াছাড়ি, আগেকার সে সোহাগসম্ভাষণ এখন খুঁজিয়া মনে করিতে হয়।

কর্ত্তার বয়স যখন পঞ্চাশ, তখন গিন্নির মৃত্যু হইল। তখন বুড়োর মনে অতীত যৌবনের সকল স্মৃতি নূতন হইয়া উঠিল, চোখের সামনে সেই চোদ্দ বছরের ফুটন্ত কলি মেয়েটিরই ছবি জাগিতে লাগিল। বুড়ো শোকে বড় কাতর হইল—সে শোক

বুড়ীর মৃত্যুতে নয়,—এ শোক সেই চোদ্দ বছরের কিশোরীর স্মৃতির জন্য;—সেই বাইশ বছরের বধূর ভালোবাসার জন্য এবং বুড়ীর গিন্নিপনার জন্য অল্প স্বল্প।

বুড়ো ছেলেমেয়েগুলিকে লইয়া থাকে। মেয়েগুলির বিয়ে হইল; ছেলেগুলি যে যার কাজে দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িল; শ্মশান আগুলিয়া রহিল শুধু সেই বুড়ো।

বছরখানেক ধরিয়া বুড়ীর একএকটি গুণের কথা একশবার বলিয়া বলিয়া সে তার বন্ধুদের বিরক্ত করিয়া তুলিল। তারপর যা ঘটিল সে বড় চমৎকার!

একটি আঠারো বছরের সুন্দরীর সঙ্গে বুড়োর আলাপ হইল। তাহার আকৃতির মধ্যে—কি আশ্চর্য্য—বুড়ো তার মৃত পত্নীর চোদ্দ বছর বয়সের ছবিখানির চমৎকার সাদৃশ্য দেখিতে পাইল। সেই কোন সুদূর অতীতের আমবাগানের চোদ্দ বছরের মেয়েকে দেখিয়া যেমন সেদিন মনে হইয়াছিল এমনটি বুঝি আর জগতে নাই, আজ এই অষ্টাদশীকে দেখিয়াও তেমনি মনে হইল। আর মনে হইল এ প্রজাপতিরই নির্ব্বন্ধ! এ বিধাতারই লীলা!

শুধু যে বুড়োই যুবতীকে দেখিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল তাহা নয়, যুবতীও বুড়োকে ভালোবাসে! বুড়োর শূন্য ভাঙা মন সুখে গর্ব্বে ভরাট হইয়া উঠিল—এখনো সে একেবারে অপদার্থ নয়, পঞ্চাশ বছরেও সে অষ্টাদশীর হৃদয়জয়ী!

বুড়ো আবার বিয়ে করিল, নইলে যে সংসার চলে না; বুড়ো বয়সে তাহাকে দেখে কে? ছেলেমেয়েগুলোকে মাতৃহীন রাখাও তো বাপের প্রাণে সহ্য হয় না।

কিন্তু ছেলেমেয়েগুলো এমনি অকৃতজ্ঞ, বাপের এতবড়

স্নেহের নিদর্শনটাকে তারা তাদের মায়ের প্রতি অপমান মনে করিল, বুড়ো বয়সে বাপের কাণ্ড দেখিয়া তাদের মাথা হেঁট হইল, লজ্জায় তাদের নাকি লোকালয়ে মুখ দেখানো ভার হইল। শোন একবার কথা!

এমন অকৃতজ্ঞতা কি বরদাস্ত হয়! বুড়ো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক তুলিয়া দিল। নূতন উৎসাহে নূতন গিন্নি লইয়া নূতন-পাতা ঘরকন্নায় বুড়ো মন দিল। বুড়োর বুড়ো-বন্ধুরা বলাবলি করিল—বুড়ো-গাছে দোফলা ফসল রকমারির বাহার বটে, কিন্তু সে না মিষ্টি না টক, পানসে!

বছর ফিরিতে না ফিরিতে নববধূর সন্তান হইল। বুড়ো-বয়সে একেই ঘুম কম হয়, তাহাতে আবার শিশুর কান্নায় বুড়োর ভারি ঘুমের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। এ বয়সে কি এসব ঝঞ্ঝাট ভালো লাগে? বুড়ো পৃথক ঘরে শয্যা রচনা করিল।

বধূ ইহাতে নারীভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া কাঁদিল; রমণীর জীবন কি দুঃখদুর্ভর! বছরখানেক আগে বুড়ো তাহার কানে যেসব সৃষ্টিছাড়া মনভুলানো কথা বলিয়াছিল এখন তাহার আগাগোড়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তখন তাহার মনে তাহার ভাগ্যবতী সতীনের উপর হিংসা জাগিতে লাগিল। এটা যেন সম্পূর্ণ তার সতীনেরই দোষ, যে, সে তার স্বামীর সকল মাধুর্য্য সকল সোহাগ নিঃশেষে উপভোগ করিয়া তবে মরিয়াছে এবং তাহার জন্য রাখিয়া গেছে শুধু অনাদর আর উপেক্ষা। সে মনে করিতে লাগিল তাহাকে যে বিবাহ করা সে কেবল তাহার সতীনের শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার জন্য, তাহার

যতটুকু আদর সে সতীনেরই স্মৃতির উদ্দেশে। তাহার নিজের কিছু নাই, মনে করিয়া সে ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

এখন সে স্বামীর মনোহরণের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া যেসব বিলাসকলা প্রণয়লীলার অনুষ্ঠান করিতে সুরু করিল তাহা বুড়োর কাছে বড় বাড়াবাড়ি ও ন্যাকামি বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। বুড়ো মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল। এখন কথায় কথায় বুড়োর মনে তুলনায় সমালোচনা জাগে—মনে হয় আগেরটি যেমন সরল সোহাগী ছিল এটি তেমন নয়, এর মেজাজটা চটা, ঢংটা পাকামি, ব্যবহারটা অসঙ্গত। তখন বুড়োর মনে তার পূর্ব্বপক্ষের ছেলেমেয়েগুলির প্রতি মমতা ফিরিয়া আসিল। গৃহ তার অতিরিক্ত অস্বস্তিকর মনে হইতে লাগিল। তার বুড়ো বয়সের কাণ্ডখানা আগাগোড়া মূর্খতারই নামান্তর বলিয়া প্রতিভাত হইল। এমন ভুলটা না করিলেই ছিল ভালো। ভাবিতে ভাবিতে তাহার সমস্ত জীবন ভার হইয়া উঠিল।

এতদিন তাহার মনের মধ্যে সেই আমবাগানের চোদ্দ বছরের মেয়েটির রূপই শুধু জাগিতেছিল—যাহার সাদৃশ্য সে দু-দুবার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল এবং দুবারই সেজন্য বেদনা পাইয়াছে,—একবার তাহার কন্যার আকৃতিতে, আরবার এই দ্বিতীয়া পত্নীর মধ্যে। কিন্তু এখন, এই জীবনের অবসান-সময়ে, এই নিরানন্দ সংসারে, পত্নীর কর্কশ ভৎর্সনা পরিপাক করিতে করিতে, তাহার সম্মুখে জাগিয়া উঠিল সেই ধৈর্য্যশীলা কর্ম্মপটু গৃহিণীমূর্ত্তি—যে নীরবে শুধু সংসার দেখিয়াছে, স্বামীপুত্রের সেবা করিয়া গিয়াছে, যে কখনো একটি অপ্রিয় বা রূঢ় কথা উচ্চারণ করে নাই। যে তুচ্ছ মোহে চোদ্দ বছরের তরুণীর রূপে

সে মজিয়াছিল, আজ বৃদ্ধ বয়সে ধাক্কা খাইয়া সে মোহ তাহার কাটিয়া গেল; এখন বুড়ো বুঝিল চোদ্দ বছরের তরুণীরই প্রণয় পরিণতি পাইয়াছিল সেই সেবা-নিপুণা গৃহিণীতে; বৃথাই সে তাহাকে তুচ্ছ করিয়া শুধু আকৃতির সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া ভুগিয়াছে। এখন সে মৃত্যুর ভিতর দিয়া তাহারই সহিত মিলনের অপেক্ষা করিয়া দিন গণিতে লাগিল।

নিষ্কৃতি

তাহারো অবস্থা একদিন ভালো ছিল, এখন বটে সে দীনহীন বিশ্রী পঙ্গু।

তাহার দশ বৎসর বয়সের সময় যখন প্রথম তাহাদের গ্রামের পাশ দিয়া নূতন রেলগাড়ী চলে তখন সে সেই অপূর্ব্বদৃষ্ট অঘটনায় কৌতূহলাকৃষ্ট হইয়া গাড়ী দেখিতে গিয়া চাপা পড়িয়া মরিতে মরিতে বাঁচিয়া যায়। কিন্তু তাহার পা দুখানি গাড়ীর চাকায় এমন থেঁতো হইয়া যায় যে তাহাকে হুগলির হাঁসপাতালে লইয়া দুখানা পাই কাটিয়া দিতে হয়। সেই অবধি সে অকর্ম্মণ্য, বিশ্রী, পরের গলগ্রহ; তখন হইতে সে ভিক্ষাজীবী।

তাহার নাম ছিল ফটিকচাঁদ। গ্রামের সবাই তাহাকে ফটকে বলিয়া ডাকিত। সে অতি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন, অনাথ হইয়াছিল; কিন্তু সেই শৈশবেই গৃহস্থের বাড়ীতে রাখালি করিয়া,

ক্ষেত নিড়াইয়া, মজুরী করিয়া, সে আপনার গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জ্জন করিত, এবং যে গৃহস্থের কর্ম্ম করিত তাহার গৃহে আশ্রয়ও পাইত।

কিন্তু যখন সে কাটা পা লইয়া দুইটা লাঠির উপর ভর করিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে আপন গ্রামে ফিরিয়া আসিল, তখন সে একেবারে অকর্ম্মণ্য, সুতরাং নিরাশ্রয়। তাহার তখন ভিক্ষার জন্য কুণ্ঠিত হস্ত প্রসারণ করা ছাড়া আর গত্যন্তর রহিল না।

লাঠির ভরে ঝুলিয়া ঝুলিয়া সে পথে পথে, মাঠে মাঠে, খামারে খামারে ঘুরিয়া বেড়াইত। দুই বগলে দুই লাঠির উপর ভর করাতে কাঁধ দুইটা ঠেলিয়া উঠিয়া তাহার ছোট্ট মাথাটাকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিত। তখন তাহার সেই চামচিকার মতো দোদুল্য মূর্তি গ্রামিকদিগের করুণা অপেক্ষা হাস্যই অধিক উদ্রেক করিত। অকর্ম্মণ্য বিকলাঙ্গ নিরাশ্রয় বালককে অশিক্ষিত চাষারা বিদ্রূপহাস্য ভিন্ন আর বড় কিছু দিত না। বালকেরা তাহার দুই লাঠির মধ্যে দোদুল্য মূর্তির সহিত ঘণ্টার সাদৃশ্য দেখিয়া তাহার নাম রাখিল 'ঘণ্টাকর্ণ' এবং তাহাকে দেখিলেই ঘণ্টাকর্ণ বলিয়া খেপাইত।

এই কৃষকপল্লীর মধ্যে মাত্র দুই ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল। কিন্তু সংসর্গ ও শিক্ষার অভাবে তাহাদের ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কারটুকু ছাড়া আর বিশেষ কোনো সদ্‌গুণ অবশিষ্ট ছিল না। তাহাদেরই এক ঘরে তারা-ঠাকরুণ ছিলেন বিধবা নিঃসন্তান। ফটিক যখন দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া সকলের হাস্য বিদ্রূপ নীরবে পরিপাক করিয়া রিক্ত হস্তে শূন্য জঠরে ভারাক্রান্ত মনে তারা-ঠাকরুণের গৃহদ্বারে উপনীত হইত, তখন সেই নিঃস্ব বিধবা কি জানি কেন তাহাকে মুড়ি গুড়

দিয়া জল খাওয়াইতেন, এবং প্রসাদ পাইবার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিতেন। সেদিন বিধবার সামান্য হবিষ্যান্নের অধিকাংশই পাতে পড়িয়া থাকিত। ফটিক মাঠাকরুণের প্রসাদ পাইয়া তৃপ্ত হইত।

তারাঠাকরুণের কাছে গেলেই যখন সহজে আহার জুটিতে লাগিল তখন ফটিকচাঁদ অন্য চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া তাহার নিত্যকার নিমন্ত্রণ তারা-ঠাকরুণের কাছেই গছাইল। ক্রমে গোহালঘরের পাশে বিচালির মাচার উপর সে আপনার আশ্রয়ও রচনা করিয়া লইল।

কিন্তু তাহার সে সুখের দশা অধিক দিন টিকিল না। তারা-ঠাকরুণের মৃত্যু হইল। ফটিকচাঁদ পুনর্ব্বার বিশ্বপরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু ভাগের মা প্রায়ই গঙ্গা পায় না; ফটিকচাঁদ বিশ্বের গলগ্রহ বলিয়া কেহই তাহার প্রতি করুণা করিত না।

গ্রামে তাহার ভিক্ষালাভ দুর্ঘট হইয়া উঠিল। গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। যাহাকে নিত্য নিয়ত দেখিতেছে তাহাদের সেই আজন্মকালের পরিচিত ফটকে, তাহাকে গ্রামবাসিগণ ভিক্ষা দিতে চাহিত না। তাহারা তাহাদের গ্রামে নিত্য নিত্য সমাগত কত অপরিচিত ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিত; প্রত্যেক গৃহস্থ একাধিক অথিতির পরিচর্য্যা করিত; কারণ ইহারা এই নূতন আসিয়াছে, আর কখনো আসে নাই, আর কখনো আসিবে কি না তাহারো ঠিকানা নাই, সুতরাং মোটের উপর অধিক খরচ পড়িলেও এক দিন বৈ নয় মনে করিয়া নিত্যই নূতন বহু ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে কখনোই কেহ আপত্তি করিত না। কিন্তু তাহাদের পরিচিত ফটকে কেন যে

তাহাদের দয়ার উপর নিত্যকার দাবী লইয়া বসিয়া আছে তাহা তাহারা বুঝিতে পারিত না এবং বুঝিতে পারিত না বলিয়াই তাহাকে সহ্য করিতে পারিত না। তাহাকে দেখিলেই তাহারা বিরক্ত হইয়া উঠিত ; তাহার পঙ্গুকদর্য্যতাও সুখদর্শন বলিয়া মনে হইত না।

কিন্তু তথাপি ফটিকচাঁদ সে গ্রাম ছাড়িয়া নড়িবার নামটি করিত না। সে সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে আপনার ক্ষুদ্র গ্রামখানি ছাড়া সংসারে অপর গ্রামের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অজ্ঞ ছিল। একবার সে গ্রামের বাহির হইয়া হুগলি গিয়াছিল, কিন্তু উঃ, সে কি অবস্থায়! বাপরে! মনে করিলে এখনো হৃৎকম্প হয়! যে পুলিশকে সে আবাল্য যমদূতের অপেক্ষাও ডরাইত, ভূতের মতো যাহার নাম করিলে শরীর শিহরিত, সেই পুলিশ কিনা তাহাকে টানিতে টানিতে হুগলি লইয়া গিয়া তাহার পা দুখানা কাটিয়া দিল! বাহিরের সহিত তাহার পরিচয় তো এই ভয় ও বিপদের ভিতর দিয়া, সে বাহিরকে বিশ্বাস করিবে কেমন করিয়া? তারপর সেই অপয়া রেলের লাইনটা গণ্ডির মতো কি একটা বিকট আশঙ্কা দিয়া তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, সে উহা ডিঙাইয়া কোথায় গিয়া আবার কোন্ বিপদে পড়িবে? সুতরাং সে সমস্ত হৃদয়হীন বিদ্রূপ ও তিরস্কার সহ্য করিয়া, ক্ষুধা দমন করিয়া আপনার আবাল্যের পরিচিত গ্রামখানিকেই আঁকড়াইয়া পড়িয়া ছিল।

যখন বিরক্ত গৃহস্থ তাহার প্রতি পরিচিত উপেক্ষাভরে ভিক্ষার বদলে উপদেশ দিয়া বলিত "এখানে ট্যাঙস ট্যাঙস করে' না বেড়িয়ে ভিন্‌গাঁয়ে ভিক্ষেয় যেতে পারিস্ না!" তখন ফটিক আশঙ্কা-ভরা মৌন দৃষ্টিতে একবার উপদেশদাতার মুখের দিকে তাকাইয়া

মাটির দিকে চাহিয়া ভাবিত, সে কোথায় যাইবে, সে কোন গাঁয়ে, সে কাহাদের মাঝে? সেখানে না জানি কত পুলিশ রক্তের মতো লাল পাগড়ী বাঁধিয়া কত অত্যাচারের আয়োজন লইয়া ফিরিতেছে; সেখানে কত অজানা মুখে অপরিচিত তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাহাকে বিদ্ধ করিবে, প্রশ্ন করিবে; কত অনভ্যস্ত বিদ্রূপ, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অপমান তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিবে।

সব দিন তাহার আহার জুটিত না, মাথা গুঁজিবার একটু আশ্রয়ও মিলিত না। গ্রীষ্মকালে সে যেখানে-সেখানে পড়িয়া থাকিত; শীতবর্ষায় চুরি করিয়া কাহারো গোহালে কাহারো খামারে রাত্রিযাপন করিত, আবার ভোর হইতে না হইতে চোরের মতো সরিয়া পড়িত। সে এইরূপে সকল গৃহস্থের মধ্যে গৃহহারা, মানুষের মধ্যে বন্যপশুর মতো তাড়িত লাঞ্ছিত। তথাপি সে আপনার দুর্ব্বহ জীবনভার লইয়া আজন্মের পরিচিত গ্রামখানিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া ছিল। কাহারও সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল না, কাহাকেও সে ভালো বাসিত না, ভালোবাসা না পাইয়া সে ভালোবাসিতেও শিখে নাই। কবে একবার কিছুদিনের জন্য তারা-ঠাকুরুণ তাহার অন্ধকারসমাচ্ছন্ন হৃদয়ে একটি ক্ষীণ প্রেম-বর্ত্তির রশ্মিপাত করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই আলোকে ভালো করিয়া হৃদয়ের সন্ধান পাইবার পূর্ব্বেই সে আলোকটুকুও অন্ধকার বাড়াইয়া নিভিয়া গেল, তাহার প্রাণ এখন যে-কে-সেই শূন্য অন্ধকার!

আজ দুই দিন তাহার কিছুই আহার জুটে নাই। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। তাহাকে ভিক্ষার জন্য আসিতে দেখিলেই শিশুকুল চীৎকার করিয়া উঠিত 'ঘণ্টা বেজেছেরে, ঘণ্টা বেজেছে।'

কোনো পুরুষ তাহা শুনিয়া দারুণ অবজ্ঞার সহিত বিদ্রূপ মিশাইয়া বলিত, 'আসুক ঘণ্টা, পাবেও ঘণ্টা।' রমণীগণ তাহাকে গৃহদ্বারে উপনীত দেখিলে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে "পোড়াকপালে ঘণ্টা, আবার জ্বালাতে এসেছিস্! এত লোকের মরণ হয় তোর কি মরণ নেই, যম কি তোকে ভুলে রয়েছে! আমার সোনার বাছাদের আমি খেতে দিতে পারিনে, তোকে কোত্থেকে ভিক্ষে দেবোরে ছারকপালে!"— এই মিষ্ট সম্ভাষণ নীরবে সহ্য করিয়া ক্ষুৎকাতর ম্লান মুখে যখন সে এক দ্বার হইতে দ্বারান্তরে চলিয়া যাইত, তখন কোনো ভামিনী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনীর উদ্দেশে বলিত "ঘণ্টাকর্ণের ঠ্যাকার দেখেছিস, আর দাঁড়ানো হলনা, অমনি গোস্‌সাভরে বুক ফুলিয়ে গা দোলাতে দোলাতে চলে যাওয়া হ'ল। মরণ আর কি! তবু যদি চাল চুলো থাকত!' তাহার নির্ব্বাক বেদনা পল্লীরমণীদিগের নিকট অহঙ্কারের পরিচয় দিত, তাহার পঙ্গু ব্যাহত গতিভঙ্গি তাহাদের নিকট গর্ব্বের আস্ফালন বলিয়া বোধ হইত। প্রায় সকল গৃহেই তাহার এইরূপ রূঢ় অভ্যর্থনা জুটিত। কোনো রমণী নিতান্ত দয়ার্দ্র হইলে বলিত, "হাঁরে ঘণ্টা, ভিন্ গাঁয়ে যাসনে কেন? বারোমাস ত্রিশ দিন কি একটা মানুষকে পোষা যায়?"

বারো মাস ত্রিশ দিন একটা মানুষকে পুষিতে তাহারা নারাজ, কিন্তু ক্ষুধা রাক্ষসী তাহা বুঝিত না, সে বারো মাস ত্রিশ দিন ফটিকচাঁদকে অতিরিক্ত ভাবেই পাইয়া থাকিত।

প্রত্যাখানের পর প্রত্যাখ্যান, বিদ্রূপের পর অপমান মাত্র লাভ করিয়া গোটাগুটি দুটা দিন ফটিকের অনাহারেই কাটিয়া গেল। তখন ক্ষুধার তাড়নায় সে গ্রামান্তরে গিয়া আপনার অদৃষ্ট

পরীক্ষা করিবে স্থির করিল। কিন্তু তাহাদের গ্রাম হইতে পূরা এক ক্রোশ পথ না হাঁটিলে অন্য গ্রাম পাইবার উপায় নাই। সে কেমন করিয়া তাহার ক্ষুৎকাতর দুর্ব্বল দেহ বহন করিয়া এই দুস্তর পথ উত্তীর্ণ হইবে তাহাই সে ভাবিয়া আকুল হইল।

কিন্তু তাহাকে যাইতেই তো হইবে। নিরুপায় ফটিক গ্রামান্তরের উদ্দেশে তাহার চিরপরিচিত গ্রামখানি ছাড়িয়া, ত্রাস সন্দেহ নিরাশা মাত্র সম্বল লইয়া যাত্রা করিল।

আষাঢ় মাস। বর্ষার প্রারম্ভ, উতলা বাতাস নগ্নক্ষেত্রের উপর দিয়া হাহা করিয়া ছুটাছুটি করিতেছিল, কালো কালো ফুলো ফুলো মেঘগুলি দুঃখের প্রতিমূর্ত্তির মতো গম্ভীর নিস্তব্ধভাবে আকাশের ম্লান শুষ্ক বুকের উপর দিয়া কে জানে কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছিল। তাহারি মধ্যে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া ফটিকচাঁদ চলিতে লাগিল।

সিক্ত পথের কর্দ্দমে তাহার যষ্টি প্রোথিত হইয়া বসিয়া যায়, কষ্টে একবার এটা আবার ওটা উঠাইয়া উঠাইয়া দুই দিনের অনাহারক্লিষ্ট পঙ্গু তাহার জীবনোপায়ের সন্ধানে চলিতে লাগিল। পঙ্গুর স্বল্পাবশেষ শক্তি অনাহারে ক্ষীণতর হইয়াছিল, এক্ষণে কর্দ্দমাক্ত পথে চলিতে গিয়া সে অল্পেই বিষম ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে আলের ধারে বসিয়া বিশ্রাম করে, আবার চলে। এই নিরুদ্দেশ যাত্রা ও ক্ষুধা তাহার মনকে এক অজ্ঞাত মোহে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার মনে তখন একমাত্র চিন্তা জাগিতেছিল 'খাইতে হইবে।' কিন্তু হায়, কোথায় কেমন করিয়া তাহা সে জানিত না।

তিন ঘণ্টা গুরু পরিশ্রমের পর সে আপনাকে টানিতে টানিতে

এক গ্রামে আনিয়া ফেলিল। সেই গ্রামে প্রথম যাহাকে দেখিল তাহারই নিকট হাত পাতিয়া ভিক্ষা চাহিল। সে একবার রূঢ় কৌতুহলের দৃষ্টিতে চাহিয়া "আরে মোলো তুই আবার আমাদের জ্বালাতে এসেছিস" বলিয়া প্রস্থান করিল।

একে একে ফটিক সকল দ্বারে হাত পাতিয়া ঘুরিল, কেহ তাহাকে এক মুষ্টি খাদ্য বা একটা পয়সা দিল না, যেখানে গেল সেখানেই তাড়া খাইয়া ফিরিল। দুর্ভিক্ষের দারুণ আশঙ্কায় সকলের করুণা যেন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, হৃদয় রুদ্ধ হইয়াছিল, ক্রোধ মনের মধ্যে গুমরিয়া উঠিতেছিল, আজ ক্ষুধিতকে অন্ন দিতে কেহ প্রস্তুত নয়।

ফটিক যখন একে একে সকল গৃহদ্বার হইতে নিষ্ফল হইয়া ফিরিল, তখন সে বগল হইতে লাঠি দুটা ফেলিয়া অছিমদ্দি মোড়লের বাড়ীর পাশে এক গাছতলায় লুটাইয়া পড়িল। এতক্ষণ আশা তাহার ক্ষুধায় অবসন্ন পঙ্গু দেহটাকে টানিয়া লইয়া ফিরিতেছিল, আশাই যদি বিদায় লইল এখন আর তাহার ক্লান্ত দেহ বহন করিবে কে? সে মৃতকল্প হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, সে এইরূপে পড়িয়া পড়িয়া মোহ অবসাদের মধ্যেও ক্ষীণ আশার কুহক রচনা করিতেছিল। সে যখন মানুষের নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া নিষ্ফলতার আঘাতে অবসন্ন, তখনো সে বৃষ্টিধারার মধ্যে পড়িয়া পড়িয়া দৈব সাহায্যের কল্পনা করিতেছিল।

অছিমদ্দি মোড়লের প্রাঙ্গন হইতে একটা ধাড়ী মুরগী এক পাল ছানা লইয়া চরিতে চরিতে ফটিকের কাছে আসিয়া চঞ্চু ও পদনখ দিয়া সিক্ত মৃত্তিকা খুঁড়িয়া উটকাইয়া কীটের সন্ধান করিতে লাগিল। ক্ষুধা রাক্ষসী ফটিকের কানে কানে

কুমন্ত্রণা দিল, একটা মুরগীর ছানাও যদি সে হস্তগত করিতে পারে তবে কোথাও পুড়াইয়া লইলেও ত কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে। ক্ষুধার কুমন্ত্রণায় হিন্দু ফটিক মুরগী খাইবারও প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিল না। একটা আধলা ইঁট কুড়াইয়া ফটিক এদিক ওদিক চাহিয়া ঝাঁ করিয়া মুরগীর ঝাঁকের মধ্যে ছুড়িয়া দিল, দুইটা ছানা আহত ও রক্তাক্ত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, ধাড়ী মুরগীটা শোকার্ত্ত চীৎকারে বাকি ছানাগুলিকে আপনার পক্ষপুটে ঢাকিয়া লইয়া পলায়ন করিল।

ফটিকের চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল, উল্লাস জাগিয়া উঠিল, অবসন্ন দেহ আহারের আশায় স্ফূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল, সে হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইয়া হাত বাড়াইয়া ছানা দুটিকে লইতে গেল, আর সেই মুহূর্ত্তে সে ঘাড়ের উপর কাহারও বজ্রমুষ্টির প্রহার লাভ করিয়া মুখ থুবড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

মাথা তুলিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই অছিমদ্দি মিঞার বজ্রমুষ্টি ও বিভীষণ লাথি সেই স্বল্পদেহ পঙ্গুকে বারংবার লুটাপুটি খাওয়াইতে লাগিল। ইঁট, খোলামকুচি প্রভৃতি কঠিন ধারালো জিনিষের সংঘর্ষে তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হইয়া উঠিল, সে নির্বাক নিস্পন্দভাবেই সমস্ত প্রহার সর্ব্বাঙ্গে গ্রহণ করিল, তাহার বাধা দিবার বা আপত্তি করিবার কিছুমাত্র সামর্থ্য অবশিষ্ট ছিল না। অছিমদ্দি যখন ক্লান্ত হইয়া প্রহার হইতে বিরত হইল তখনো ফটিক উঠিয়া বসিতে পারিল না, পড়িয়াই মিট মিট করিয়া শুধু তাকাইতে লাগিল। অছিমদ্দি তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া দিল। এবং আপনার পুত্রকে থানায় খবর দিতে পাঠাইল।

অর্দ্ধমৃত ফটিক রক্তাক্ত কলেবরে পুলিশের অপেক্ষা করিয়া রহিল, সে যে তিন দিন কিছু খায় নাই, তাহার উপর এই দারুণ প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়াছে, সে কথা সে ভুলিয়া গেল, এখন পুলিশের আশঙ্কা তাহার হৃদয় মনকে একেবারে আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

সকাল গেল, মধ্যাহ্ন গেল, বৈকাল গেল, তাহার চোখের সামনে বসিয়া অছিমদ্দি সপরিবারে হাপুস হুপুস শব্দ করিয়া একরাশ ডাল ভাত উদরসাৎ করিল। বৈকালে ছোট ছোট ছেলেরা ছোট ছোট ধামী ভরিয়া মুড়ি মুড়কি লইয়া ফটিককে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া জলযোগ করিল, কিন্তু ফটিকের আহার জুটিল না। অছিমদ্দির মাচায় শশা ফলিয়াছে, গাছে কলা পাকিয়াছে, কাকে হনুমানে খাইতেছে আর নিরাহার ফটিক বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতেছে। কত পসারী হাটে কত কি খাদ্য লইয়া গেল, কত লোক কত কি খাদ্য কিনিয়া লইয়া ঘরে ফিরিল, উপবাসী ফটিক বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতেছে ও পুলিসের প্রতীক্ষা করিতেছে।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পুলিসের জমাদার কাদের বক্স খাঁ দুই জন কনেষ্টবল সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। অছিমদ্দি মোড়ল প্রচুর আহারপুষ্ট ভুঁড়িওয়ালা জমাদার সাহেবকে এক কাঁদি কলা, ১০টা পাকা শশা, এক কুড়ি আণ্ডা ও এক জোড়া মুরগী ভেট দিয়া এজেহার দিল, ঐ ন্যাংড়া দুষ্টটা তাহার মুরগীর ছানা চুরি করিতেছিল, অছিমদ্দি তাহাকে বাধা দেওয়ায় অছিমদ্দিকে তাহার বগলের লাঠি লইয়া মারিতে আসে, অগত্যা আত্মরক্ষার্থ অছিমদ্দি তাহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দেয়, তাহাতেই সে

খোলামকুচির উপর পড়িয়া কাবু হইয়া পড়ে, অনেক ধস্তাধস্তির পর দুষ্টটাকে আয়ত্ত করা গিয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন জমাদার সাহেব উপহৃত সামগ্রী কনেষ্টবলদ্বয়ের জিম্বা করিয়া ফটিককে বুট জুতার এক ভীম ঠোক্কর মারিয়া বজ্রনিনাদে হুকুম করিল, "উঠ্‌রে কমবক্ত্, চল্।"

উপবাসী প্রহারজর্জ্জরিত ফটিক তখন একেবারে উত্থানশক্তি-রহিত, অনড়, সে ভয়ে ভয়ে আপনার ক্লান্ত অবসন্ন দেহভার উঠাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। জমাদার সাহেব তাহার এই অক্ষমতা দুষ্টের ছল মনে করিয়া কনেষ্টবলদের হুকুম দিল, "দুষ্টকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া চল্।"

কনেষ্টবলদ্বয় তাহাকে হেঁচকা দিয়া উঠাইয়া তাহার লাঠির উপর প্রতিষ্ঠিত করিল। শিকারীর সম্মুখে শিকারের মতো, বিড়ালের সম্মুখে ইঁদুরের মতো ফটিকের সমস্ত বুদ্ধি লুপ্ত হইয়া কেবল ভয়ের আব্‌ছায়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল। ফটিক সেই ভয়ের জোরেই কোনোমতে আপনাকে বহন করিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

প্রহরীবেষ্টিত হইয়া সে যখন ন্যাংচাইয়া ন্যাংচাইয়া প্লুত গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল তখন শিশুরা করতালি দিয়া কলরব করিয়া উঠিল, রমণীগণ মুখে কাপড় চাপিয়া হাসিল, পুরুষেরা দন্তে দন্ত রাখিয়া কটু কহিল। সেসকল অপমানের প্রতি ফটিকের লক্ষ্য ছিল না, সে চক্ষে ঝাপসা দেখিতেছিল, তাহার কর্ণে তালা লাগিয়াছিল, বোধশক্তি লুপ্ত হইয়াছিল, সে ভয়ে যন্ত্রের মতো আপনাকে কোনোমতে বহন করিয়া চলিয়াছিল মাত্র।

পথে যাইতে যাইতে কত পথিক তাহাকে দেখিয়া চোর বা খুনে ভাবিতেছিল, আর স্বয়ং জমাদার ভাবিতেছিল কেমন করিয়া এই ব্যাপারটাকে স্বদেশী মামলা করিয়া তুলিতে পারা যায়।

প্রহরেক রাত্রির সময় তাহারা থানায় পৌঁছিল। ফটিক একটি কথাও বলিল না! তারা ঠাকুরুণ মরিয়া যাওয়ার পর তাহার সহিত কেহ করুণ ভাবে কথা কহে নাই, সেও সেই জন্য কখনও কাহারও সহিত কথা কহিবার বড় একটা আবশ্যক বোধ করে নাই। অব্যবহারে তাহার জিহ্বা জড় হইয়া গিয়াছিল, এখন ক্ষুধা ও ভয়ে তাহা তো পেটের দিকে টানিতেছিল। আর সে কিই বা বলিবে, তাহার বলিবারই বা আছে কি!

ফটিককে হাজতে পূরিয়া চাবি দিল। তাহার যে আহারের আবশ্যক হইতে পারে ইহা কাহারো খেয়াল হইল না। পরদিন প্রভাতে দারোগা সাহেব যখন খোঁয়াড়ি ভাঙিয়া উঠিয়া তামাকু সেবা করিতে করিতে রাত্রের খুনেটাকে হাজির করিতে হুকুম দিলেন, তখন কনেষ্টবলগণ হাজতে গিয়া দেখিল ফটিক কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে। তাহারা তাহার নিদ্রা ভাঙাইবার জন্য প্রথমে জুতার ঠোক্কর, পরে লাঠির গুঁতা মারিয়াও তাহার আর সাড়া পাইল না!

নষ্টোদ্ধার

১

খ্রীষ্টমাসের আগের দিন সকালবেলা দুইটি অসাধারণ ঘটনা একই সঙ্গে ঘটিয়াছিল—সূর্য্যদেব আর ম্যস্‌সিয় জাঁ-বাপ্তিস্ত গোদক্রয় সকালবেলাই উঠিয়াছিলেন।

নিঃসন্দেহ, ভরা শীতের মাঝখানে, পনরদিনের কোয়াসা আর মেঘলা আকাশ ঝাঁটাইয়া যখন সৌভাগ্যক্রমে উত্তুরে বাতাস বহিয়া দিনটিকে শুকনা ও স্বচ্ছ করিয়া তুলিয়াছিল তখন সূর্য্যদেবকে অকস্মাৎ তাঁহার তপ্ত রক্তরাগে পুরাতন বন্ধুর মতো প্রাভাতিক পারীশহরকে আলিঙ্গন করিতে দেখিয়া সকলেই খুসি হইয়া উঠিয়াছিল। সূর্য্যদেব হাজার হোক বড় কেউ-কেটা তো নহেন—তিনি দেবতা বলিয়া বহুকাল হইতেই পূজা পাইয়া আসিতেছেন। এ দিকে ম্যস্‌সিয় জাঁ-বাপ্তিস্ত গোদক্রয়, তিনিও বড় কেউ-কেটা লোক ছিলেন না—তিনি ধনবান মহাজন, সরকারী সুদী কারবারের বড় সাহেব, অনেক কোম্পানির ডিরেক্টার, কত সভা সমিতির মেম্বর, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইনি বরং সূর্য্যদেবের চেয়েও একগুণ সেরা—সূর্য্যদেবকে তাঁহার উদয়কালের নির্দ্দিষ্ট সময়ে আকাশে দেখা আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়, কিন্তু সেই সময় ম্যস্‌সিয় গোদক্রয়ের জাগরণ নিতান্তই আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে সেই দিন সকালবেলা পৌনে আটটার কাছাকাছি শ্রীযুক্ত সূর্য্যদেব আর শ্রীযুক্ত গোদক্রয় এক সঙ্গেই উঠিয়াছিলেন।

কিন্তু এই লক্ষ্মীর বরপুত্রটির জাগরণ সূর্য্যদেবের জাগরণ হইতে ভিন্ন ধরণের হইয়াছিল। সেই চিরন্তনকালের অতিপুরাতন তবু

লোকপ্রিয় সূর্য্য উদয়মাত্রেই যাদুকরের মতো চারিদিকে মায়ার খেলা জুড়িয়া দিল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ঝুরো চিনির মতো চূর্ণ তুষার পল্লবহীন বৃক্ষগুলিকে ঢাকিয়া চিনির খেলনার মতো সাজাইয়া রাখিয়াছিল; যাদুকর সূর্য্য উদয় হইবামাত্র সেগুলিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলাপী প্রবালের তোড়া করিয়া তুলিল। এই ইন্দ্রজাল রচনা করিতে গিয়া সূর্য্য তাহার তৃপ্তিপ্রদ তপ্ত কিরণ প্রাভাতিক পথিকদের গায়ে অপক্ষপাতে ঢালিয়া ঢালিয়া দিতেছিল। তাহার হাসি জামাজোড়া-আঁটা আপিসযাত্রী বড় সাহেবের প্রতি, কম্পিত-কলেবর কেরাণীর প্রতি, ছিন্নচীর দিনমজুরের প্রতি, ট্রামগাড়ীর ক্লান্ত কণ্ডাক্‌টারের প্রতি, কিংবা নিজে শীতে কাঁপিয়া পরকে গরম করিতে অভিলাষী গরম গরম চীনেবাদামওয়ালার প্রতি সমভাবেই বর্ষিত হইতেছিল। তাহার হাসিতে বিশ্বজগৎ খুসি হইয়া উঠিয়াছিল। অপরপক্ষে শ্রীযুক্ত গোদক্রয়ের যে জাগরণ সে শুধু অসন্তোষ আর ফসাদে ভরা। রাত্রে তিনি কৃষিসচীবের প্রাসাদে ভোজের নিমন্ত্রণে সুরু হইতে পায়েস পর্য্যন্ত চাখিয়া আসিয়াছেন, সেসব এখন সাতচল্লিশ বছরের পুরাতন পাকস্থলীতে হুলস্থূল বাধাইয়া তুলিয়াছে; অম্বলে আর বুকজ্বালায় তাঁহার মেজাজটাও জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত গোদক্রয় যে-ধরণে ডাকঘণ্টার দড়ি টানিলেন, তাহা শুনিয়াই তাঁহার খাস খানসামা শার্ল তাঁহার দাড়ি কামাইবার গরম জল তাড়াতাড়ি লইয়া যাইতে যাইতে রান্নাঘরের ঝিকে চোক ঠারিয়া বলিয়া গেল—"হাঁ হাঁ! ... বাঁদরটা আজ সকালবেলাই মারমার করতে করতে উঠেছে ... ওলো গ্যারত্রিদ্, হাঁ করে আর ভাবছিস্ কি, আজকে কপালে অনেক দুঃখু অনেক ভোগান্তি

আছে।…” শার্ল ঘরের চৌকাঠের নিকট পৌঁছিয়া ভালো মানুষটির মতো পরম নম্রতায় দৃষ্টি নত করিল, এবং সসম্ভ্রমে মুনিবের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া জানালার পর্দাগুলি একে একে খুলিয়া দিল, আগুন জ্বালিল এবং মুনিবের প্রসাধনের সকল আয়োজন এমন শ্রদ্ধা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে করিতে লাগিল যেন মন্দিরের পূজারী ঠাকুরপূজার জো করিতেছে।

গোদক্রয় কোটের বোতাম লাগাইতে লাগাইতে কড়া মেজাজে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কটা বেজেছে রে?”

শার্ল উত্তর করিল—“আজ্ঞে আজ বড় শীত। ছ'টার সময় তো কনকনে ঠাণ্ডা ছিল, কিন্তু এখন হুজুর আকাশ সাফ হয়ে রোদ্দুর উঠেছে, আজকের দিনটা সুভালাভালি কেটে যাবে বোধ হয়।”

গোদক্রয় ক্ষুর শানাইতে শানাইতে জানলার কাছে উঠিয়া গিয়া পর্দা সরাইয়া দেখিলেন, পথচত্বর আলোয় স্নান করিয়া উঠিয়াছে, বরফের উপর মিঠে রৌদ্র তরুণীর অধরে স্মিত হাস্যের মতো দেখাইতেছে। ও হরি, সত্যই ত!

মানুষ যতই কেন দেমাকী আর চালদুরুস্ত হোক না, চাকর-বাকরের সামনে কোনো রকম ভাবের আতিশয্য প্রকাশ করা যতই কেন বে-আদবী লাগুক না, ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি সূর্য্যমুখ দেখিয়া মনের আনন্দ চাপিয়া রাখিবার শক্তি খুব অল্প লোকেরই থাকে। গোদক্রয় তাই অনুগ্রহ করিয়া আজ একটু হাসিলেন। বদ্ধ জলে বায়ুস্পর্শে কুঞ্চনের মতো সেই হাসিটুকু আর কাহারো মুখে দেখিলে তিনি নিশ্চয়ই খুব স্তম্ভিত হইতেন। যাহোক তবু তিনি হাসিয়াছিলেন; এবং একমিনিটের

জন্যও তিনি তাঁহার আপিস আদালত কার-কারবার সব ভুলিয়া বালকের ন্যায় অবাক প্রসন্ন মুখে দেখিতে লাগিলেন সকল পথচারী লোক ও গাড়ীঘোড়া সোনালি কোয়াসার ভিতর দিয়া কেমন আনন্দে আনাগোনা করিতেছে।

কিন্তু আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, এ ভাব তাঁহার এক মিনিটের বেশি টিঁকিতে পারে নাই। সূর্য্যের মতো শুভ্র কিরণের দন্ত-বিকাশ করিয়া হাসা শোভা পায় তাহাদের যাহারা নিষ্কর্ম্মা ফাজিল,—শোভা পায় স্ত্রীলোকের, শিশুর, ছোটলোকের, আর কবির। শ্রীযুক্ত গোদক্রয়ের কি হাসিবার অবসর আছে, বিশেষ তো আজকার দিন তাঁহার কাজের ভিড় বিস্তর আর গুরু। সাড়ে আটটা হইতে দশটা পর্য্যন্ত তাঁহাকে সমাগত বহু ভদ্রলোকের সঙ্গে বিশেষ জরুরি কারবারী পরামর্শ করিতে হইবে—যাঁহারা আসিবেন তাঁহারাও বড় কেউকেটা লোক নন, তাঁহারাও হাসেন না, তাঁহাদেরও একমাত্র চিন্তা শুধু টাকা আর টাকা। আহারের পরই তাঁহাকে আবার গাড়ী করিয়া অনেক মহাশয় ব্যক্তির দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া অনেক কথা পাকা করিয়া আসিতে হইবে,—তাঁহারাও তাঁহারই মতন মহাজন, কাহারো সহিত সরস্বতীর সদ্ভাব নাই, সকলের সেই একই ধান্দা লক্ষ্মী ঠাকরুণের প্রসন্নতা। সেখান হইতে একমিনিটও লোকসান করিবার জো নাই, শ্রীযুক্ত গোদক্রয়কে আপিসে গিয়া সবুজ-বনাত-মোড়া বড় বড় দোয়াত-ভরা টেবিলে গিয়া বিরাজ করিতে হইবে, সেখানে আবার আর একদল নূতন মহাজনের সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবে সেই একই গুরু বিষয়ে—টাকা রোজগার, অর্থসঞ্চয়, লক্ষ্মীলাভ। তাহার পর খুব সম্ভব তাঁহাকে তিন চারিটা কমিশনে বাহির হইয়া এমন সব লোকের

সংসর্গে থাকিতে হইবে যাহারা অর্থ-উপার্জ্জনের অতি তুচ্ছ সুযোগটিও ছাড়ে না অথচ ফ্রান্সের গর্ব্বগৌরবের আলোচনায় অনুগ্রহ করিয়া ঘণ্টাখানেক সময় অপব্যয় করিবার উদারতাও যাহাদের আছে।

নিত্য ক্ষৌরী হইলেও গোদফ্রয় বরাবর এমন দুচারগাছা দাড়ির খোঁচ ছাড়িয়া দেন যে দেখিলে মনে হয় যেন রাঁধা শিককাবাবের উপর নুনমরিচের বুকনি ছড়ানো; তাহাতে তাঁহাকে চাষাড়ে মন্দ বা বড় জাতের বানরের মতন দেখায়। ক্ষৌরী হইয়া জোয়ান-বয়সীর ক্ষিপ্রগতিতে একটা প্রভাত-পরিচ্ছদ গায়ে টানিয়া তিনি আপনার আপিস-কামরায় নামিয়া গেলেন। সেখানে যাহারা সারবন্দি ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল তাহাদের সকলেরই এক ধান্দা, নিজের পুঁজিটিকে পুঞ্জিত পুষ্ট করিয়া তোলা। ইঁহারা টাকা রোজগারের কত রকমের ফন্দি আঁটিয়া গোদফ্রয়ের পরামর্শ লইতে আসিয়াছেন;—কেহ চাহেন জনমানবশূন্য মরুভূমির উপর দিয়া একটা নূতন রেলপথ খুলিতে, কেহ চাহেন পারী শহরের কাছাকাছি দেহাতে কোথাও একটা প্রকাণ্ড কারখানা খুলিতে, কেহ বা চাহেন দক্ষিণ আমেরিকার কোনো দেশে একটা খনি খনন করিতে। গোদফ্রয় গম্ভীর হইয়া সব শুনিলেন; কিন্তু তিনি এক মুহূর্ত্তও ইহা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন না যে ভবিষ্য রেললাইনে বিশেষরকম প্যাসেঞ্জার বা মাল বহনের সম্ভাবনা আছে কি না, কারখানায় চিনি না সুতি টুপি তৈরি হইবে, এবং খনি হইতে খাঁটি সোনা অথবা রদি তামা উঠিবে। না, এসব বিষয়ে উচ্চবাচ্য নয়! কারবারীদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত গোদফ্রয়ের যে কথা-বার্ত্তা হইল তাহা শুধু তাঁহার দক্ষিণার দরদস্তুর—তিনি যে এই

সব কঠিন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আটদিন ধরিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া ফন্দি ফিকির আবিষ্কার করিবেন তাহার জন্য তিনি এখন পাইবেন কি। এইসব অর্থলাভের নূতন পথের কল্পনা হয় তো নক্সার কাগজে কাগজচাপার তলে বা ফাইলের ফোঁড়ে চরম গতি লাভ করিবে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তাঁহার ফিয়ের টাকা তো মারা যাইতে পারে না।

ঠিক বেলা দশটা পর্য্যন্ত অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনা চলিল; দশটা বাজিবা মাত্র সুদী কারবারের ম্যানেজার সাহেব সকলকে নির্ম্মম ভাবে বিদায় করিয়া দিয়া আপিসের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। তারপর খাবার-ঘরে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত কাজই তাঁহার ঘড়িধরা, এক মিনিটের নড়চড় হইবার জো কি।

খাবার-ঘরখানি খুব জমকালো। টেবিলে দেরাজে যত সব রূপার বাসন সাজানো ছিল তাহা দিয়া একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা সহজেই হইতে পারে! অনেকখানি সোডা গিলিয়াও গোদক্রয়ের গলাজ্বালা কমে নাই, তাই তিনি অজীর্ণ রোগীর যোগ্য খাবার জোগাড় করিতে বলিয়াছিলেন। এই বাহুল্য আড়ম্বরের মধ্যে বসিয়া দুই শত টাকার মাহিনায় বাবুর্চির পরিবেষণে তিনি আহার করিলেন বিরস বিষণ্ণ মুখে দুটি ডিম সিদ্ধ আর একখানি কাটলেট। তারপর সেই লক্ষ্মীমন্ত লোকটি চাখিলেন দুতিন পয়সা দামের একটু পনির।

এমন সময় ঘরের দরজা খুলিয়া হঠাৎ প্রবেশ করিল সুন্দর ও কৃশ, নীল-মকমলের-পোষাকপরা, পালক-ওলা টুপির তলে হাসি মুখে ডিরেক্টার সাহেবের চার বৎসরের শিশুপুত্র রাউল, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার জার্ম্মানী আয়া।

ইহা প্রতিদিন পৌনে এগারটার সময়কার নিয়মিত ঘটনা। তখন সাহেবের জুড়ি-জোতা ব্রুহাম গাড়ী গাড়ী-বারান্দায় অপেক্ষা করে, আর অসহিষ্ণু জুড়ি ঘোড়া পথের উপর খুর ঠুকিয়া চঞ্চলতা প্রকাশ করিতে থাকে। মহামহিম লক্ষ্মীমন্ত মহাজন দশটা বাজিয়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট হইতে ঠিক এগারটা পর্য্যন্ত পুত্রের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া থাকেন, এর এক মিনিট বেশিও নয়, কমও নয়। বাৎসল্যের পরিতুষ্টির জন্য তিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পনরটি মিনিট নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ইহার কারণ ইহা নহে যে তিনি পুত্রকে ভালো বাসেন না; তাঁহার মতন লোকে যতদুর পারে তিনি পুত্রকে ততদূরই ভালো বাসিতেন। কিন্তু ভালো বাসিলে কি হয়, কারবার!...

বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে যখন তিনি বেশ বৃদ্ধ এবং কতকটা জরাগ্রস্ত, তখন কেবলমাত্র ফ্যাশানের খাতিরে তিনি নিজেকে নিতান্তই প্রেমিক বলিয়া জাহির করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদেরই দলের লোক মার্কুইস ন্যুফস্তেনের কন্যার সহিত প্রেমে পড়িলেন। কন্যার পিতা ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও, বিষয়বুদ্ধিতে পরিপক্ক বলিয়া আপনার বিরক্তি তিনি বেমালুম চাপিয়া গেলেন; তিনি এই লক্ষ্মীর বাহনটির শ্বশুর হইয়া উহাকে কৃতার্থ করিবেন এবং তাহার বিনিময়ে তাহাকে দিয়া নিজের ঋণ পরিশোধ করিয়া লইবেন; তিনি যে বুড়ো জামাই করিতে রাজি হইবেন তাহার একটা প্রতিদান পাওয়া চাই তো। বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই গোদফ্রয় বিপত্নীক হইলেন এবং তাঁহার শিশুপুত্র রাউলকে তিনি সসম্ভ্রমে সসম্মানে লালন করিতে লাগিলেন, কারণ সে যে বাঁচিলে একদিন লক্ষ লক্ষ টাকার উত্তরাধিকারী হইবে। তাহাকে খাতির

না করিবে কে ? সোনার দোলনায় রাজপুত্রের হালে খোকা রাউল দিনে দিনে মানুষ হইতে লাগিল। কেবল তাহার বাবা কাজের ভিড়ে, কর্তব্যের চাপে, লোকের জ্বালায় ছেলের চিন্তায় পনর মিনিটের বেশি ব্যয় করিতে পারিতেন না ; তারপর বাকি তেইশ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ছেলে থাকিত ঝি-চাকরের জিম্মায়।

—সুপ্রভাত রাউল।

—ছুপ্‌পভাত বাবা।

শ্রীযুক্ত গোদক্রয় তাড়াতাড়ি হাতের তোয়ালে ফেলিয়া পুত্রকে কোলে তুলিয়া বাম উরুর উপর বসাইলেন এবং আপনার প্রকাণ্ড থাবার মধ্যে শিশুর কচি ক্ষুদে হাতখানি ধরিয়া তাহাকে বারংবার চুম্বন করিতে লাগিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, সত্যসত্যই তখন সেই সুদী কারবারের মহাজন ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে শতকরা তিন টাকা সুদের কোম্পানির কাগজের দর সেদিন পঁচিশ পয়সা চড়িয়াছে, কিম্বা এখনি তাঁহাকে শম্পাহরিৎ টেবিলের উপর কোলা ব্যাঙের মতো দোয়াতের কালি ছড়াইয়া কোম্পানির কাগজের সুদের হিসাব কষিতে হইবে।

—বাবা, কালকে তো বড়দিন ?—কালকে বড়দিন বুড়ো আমাকে কি খেলনা এনে দেবে বাবা ?

বুড়ো বাবা বুড়ো বড়দিনের বদলে একটু ভাবিয়া বলিলেন—হুঁ, দেবে বৈ কি ... খেলনা ··· আচ্ছা ··· তুমি লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকলেই পাবে।

বুড়া আপনার হাজার-মহলা স্মৃতির একটা কোঠায় টুকিয়া রাখিলেন খোকার জন্য বাজার হইতে খেলনা কিনিতে হইবে।

তারপর জার্ম্মানী ধাইয়ের দিকে ঘুরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা মাদ্‌মোয়াজেল্‌ ব্যার্ত্তা, রাউলের ওপর তুমি খুসি আছ তো?

জার্ম্মানী ঈষৎ হাসিয়া আপনার খুসি জানাইয়া খোকার বাপের কৌতূহল একেবারে শান্ত করিয়া দিল।

মহাজন বলিলেন—আজকে বড় খাসা দিনটি, না? কিন্তু বড় শীত। যদি তুমি রাউলকে নিয়ে কোম্পানির বাগানে বেড়াতে যাও, তা হলে আজ বেশ হয়, না ব্যার্ত্তা? কিন্তু খবরদার, খুব ঢেকেঢুকে নিয়ে যেয়ো, বুঝলে?

আয়া শুধু একবার ঘাড় নাড়িয়া মুনিবকে নিশ্চিন্ত করিয়া সকল উপদেশ পালন করিবার অঙ্গীকার করিলে শ্রীযুক্ত গোদফ্রয় শেষবার পুত্রকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া টেবিল হইতে উঠিলেন—অমনি তাকের উপর ঘড়ীতে এগারটা বাজিতে সুরু করিল—এবং তিনি ঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইতেই খানসামা শাল তাঁহার গায়ে ওভারকোট চাপাইয়া দিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর সেই নিমকের চাকর মাতাল-পাড়ার গলিতে মদের দোকানে প্রস্থান করিল—সেখানে আজ দোকানের সামনের ব্যারনের বাড়ীর চাকর বাকরদের আড্ডা জমিবার কথা আছে।

২

বাঁচিয়া সুস্থ থাকুক জরদা রঙের জুড়ি ঘোড়া, তাহাদের প্রসাদে সুদী কারবারের কর্ত্তার সকল কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে যথাসময়েই সম্পন্ন হইয়া গেল, কোথাও একটুও বিলম্ব ঘটিল না। মহাজনটোলা

ঘুরিয়া তিনি দেশপতির নির্ব্বাচনে ভোট দিয়া ফ্রান্স তথা য়ুরোপকে আশ্বস্ত করিয়া ঘরে ফিরিলেন।

পথে তাঁহার মনে পড়িল, তিনি রাউলকে বলিয়া আসিয়াছেন, বড়দিন বুড়ো তাহাকে খেলনা উপহার দিবে; তখন তিনি খেলনার দোকানে গাড়ী লইয়া যাইতে কোচমানকে আদেশ করিলেন। খেলনার দোকানে গিয়া তিনি দেখিয়া শুনিয়া পছন্দ করিয়া ছেলের জন্য সওদা করিলেন একটা কাঠের ঘোড়া চাকার উপর চড়ানো; একবাক্স সীসার সৈন্য, সবগুলির চুল কালো আর নাকগুলি উল্টানো, যেন সব যমজ ভাই কিম্বা রুষ রেজিমেণ্টের সৈন্য; এমনি আরো বিশ রকমের খেলনা, চকচকে আর চমৎকার। খেলনাগুলি গাড়ীতে তুলিয়া তিনি গাড়ীর গদিতে সুখাসীন হইয়া গতির তালে তালে নাচিতে নাচিতে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, পুত্রের ভাবী আনন্দের ছবি আঁকিয়া তাঁহার পিতৃহৃদয় বাৎসল্যের সুখে গর্ব্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

খোকা বড় হইবে, রাজার হালে তাহার শিক্ষা সহবৎ হইবে, এবং একদিন সে বিশ, পঁচিশ, চাই কি, ত্রিশ লক্ষ টাকার মালিক হইয়া গ্যাঁট হইয়া পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া বসিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইবে। রাষ্ট্রবিপ্লবের দৌলতে এখন টাকার সংখ্যাতেই খাতির, টাকার পরিমাণেই মানের মাপ, বংশের বড়াই একেবারে মাটি! রাউলের বাপ, সামান্য একজন পাড়াগেঁয়ে, সামান্য একজন মোক্তারের বেটা; রাউলের বাপ ছাত্রদের মেসে থাকিয়া এককালে সাড়ে পাঁচ আনা রোজ হিসাবে খোরাকী দিয়া মানুষ; তাহার তখন না ছিল একটা ভালো পোষাক, না ছিল কিছু মান সম্ভ্রম। সেই লোক যদি অগাধ সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া

থাকিতে পারে, প্রজাতন্ত্রের দৌলতে যদি সে রাজশক্তির ভাগ পাইতে পারে, অবশেষে যদি বিবাহে বড় ঘরানার মেয়ে পর্য্যন্ত জোগাড় করিতে পারে, তবে তাহার ছেলে রাউল, সে না পারিবে কি? শিশুকাল হইতেই যে রাজার হালে মানুষ, মাতৃবংশের দিক দিয়া যাহার শরীরে আভিজাত্যের গর্ব্বিত শোণিত প্রবাহিত, যাহার বুদ্ধি বিদ্যা দুষ্প্রাপ্য পুষ্পের মতো চমৎকার হইবে, যে দোলনায় শুইয়াই বিদেশী ভাষায় তালিম হইতেছে, এক বৎসর পরেই যে পনি ঘোড়ার সোয়ার হইবে, একদিন যে নিজের নামে মাতৃবংশের পদবী যোগ করিয়া হইবে শ্রীল শ্রীযুক্ত গোদফ্রয় ম্যুফস্তেন, গোদফ্রয় বংশের নামে এমন উপাধি যোগ, আহা, সে কী উপাধি, একেবারে রাজকীয়, অতি প্রাচীন, একেবারে ক্রুজেডের গন্ধযুক্ত উপাধি যে যোগ করিবে, সেই রাউল না পারিবে কি? কী উজ্জ্বল তাহার ভবিষ্যৎ! কী আশাপ্রদ তাহার জীবনযাত্রা! ...... সাধারণতন্ত্র ভালো বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা তো বলা যায় না, আবার হয় তো রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে; তখন আমার রাউল, না না, রাউল কেন, আমার গোদফ্রয় ম্যুফস্তেন হয় তো রাজকন্যা বিবাহ করিবে, আর কে বলিতে পারে যে তখন আমার রাউল একেবারে রাজার সিংহাসন ঘেঁসিয়া না বসিবে, রাজপারিষদের উর্দ্দি সোনালি রূপালি জরির কাজ-করা কিংখাবের পোষাক তাহার গায়ে ঝলমল না করিবে; নিশ্চয় তাহার ফেটিং গাড়ীর হাতল হইবে সোনার, পা-দান রূপার, আর থাকিবে সহিস কোচমানের পাগড়ীতে তকমা, বুকে চাপরাস, গাড়ীর গায়ে জমকালো মর্য্যাদাচিহ্ন।

হায় মূঢ় টাকার যক্ষ! আজ নিজের শিশুর আনন্দের জন্য যে শিশুর জন্ম-উৎসব-উপলক্ষ্যে এত টাকার খেলনা কিনিয়া গাড়ী

বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতেছে, সেই শিশু একদিন দীনহীন জনক-জননীর ক্রোড়ে আস্তাবলের আবর্জ্জনার মধ্যে জন্মলাভ করিয়া জগৎকে আজ জয় করিয়াছে, সে কথা তো একবারও মনে পড়িল না! শুধু অর্থের চিন্তা, সম্পদের স্বপ্ন!

চিন্তায় বাধা দিয়া গাড়ী বাড়ীর গাড়ীবারান্দায় সিঁড়ির সামনে আসিয়া থামিল। গোদফ্রয় সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে দেখিতে পাইলেন দালানে তাঁহার সমস্ত চাকর দাসী ভীতিপাংশুলমুখে তাঁহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে, এবং এক কোণে জার্ম্মানী আয়াটা জড়োসড় হইয়া পড়িয়া আছে। জার্ম্মানী তাঁহাকে দেখিবা মাত্র চীৎকার করিয়া দুইহাতে তাহার মুখ ঢাকিল, আঙুলের ফাঁক দিয়া তাহার অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এইসব দেখিয়া শুনিয়া অমঙ্গল-আশঙ্কায় গোদফ্রয়ের মুখ শুকাইয়া একটুকু হইয়া গেল।

—কি রে? ... ব্যাপার কি? ... অ্যাঁ? ...

খাস খানসামা শার্ল চোখে বেদনা ও মুখভাবে ভয় ভরিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—আজ্ঞে রাউল!...

—খোকা?

—আজ্ঞে হারিয়ে গেছে! এই নচ্ছার জার্ম্মানী মাগীই তো নষ্টের মূল! ... হারিয়ে গেছে বিকেল চারটার সময় থেকে ...

সৈন্যের বুকে গুলি লাগিলে সে যেমন কাঁপিতে কাঁপিতে হটিয়া যায়, ব্যথিত পিতাও তেমনি দুই পা হটিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন এবং জার্ম্মানী তাঁহার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া কেবলি আর্ত্তস্বরে বলিতে লাগিল—মাপ করুন! আমায় মাপ করুন!...

সকল চাকরেরা একসঙ্গে গোলমাল করিয়া বলিতে লাগিল—

এই মাগী কোম্পানির বাগানে যায়নি হুজুর! ও কি কোনো দিন রাউলকে আর কোথাও বেড়াতে নিয়ে যায়? রোজ রোজ ঐ গুণ্ডাপাড়ায় যায়, সেখানে একটা লোকের সঙ্গে ওর ভাব আছে! ... কি সর্ব্বনাশ! কচি ছেলে নিয়ে গুণ্ডাপাড়ায় যাওয়া! সেখানে ছেলে হারাবে না তো হারাবে কোথায়? ও মাগীর কি ছেলের দিকে নজর থাকে, একেবারে গল্পে মেতে যান গিয়ে। এখন ছেলে কোথায় চলেই গেল, না, গুণ্ডারাই চুরি করলে, তা কে জানে? ... আমরা ঢের তল্লাস করেছি হুজুর, কোথাও তো কিছুর কিনারা পাওয়া গেল না ...

খোকা! হারাইয়া গিয়াছে! গোদক্রয়ের কানে শুধু এই দুটি কথা প্রলয়ের মূর্চ্ছার বিষাণ বাজাইতেছিল। তিনি লাফাইয়া জার্ম্মানীর ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িলেন, কিল উঁচাইয়া তাহাকে মারিতে গেলেন, তারপর দুই হাতে তাহার দুই বাহু ধরিয়া জোরে ঝাঁকানি দিতে দিতে দাঁত কড়মড় করিয়া ক্রুদ্ধ-গর্জ্জনে বলিতে লাগিলেন—বল মাগী বল, কোথায় খোকাকে হারালি? বল হারামজাদী, নইলে তোকে মেরে গুঁড়ো করে ফেলব।...কোথায়?...কোথায়?...আমার খোকা কোথায়?...

কিন্তু সেই ঝি বেচারী শুধু কাঁপিতে কাঁপিতে ক্ষমাই চাহিতে লাগিল, আর কিছুই বলিতে পারিল না।

খোকা! তাঁহার খোকা! সে হারাইয়া যাইবে, চুরি যাইবে! ইহা অসম্ভব। যা যা সকলে মিলিয়া খোঁজ। খোকাই যদি না থাকিল তো টাকা কাহার জন্য? মুঠা মুঠা টাকা ছড়াইয়া গলিতে গলিতে বাড়ীতে বাড়ীতে জনে জনের পিছু পুলিশ লাগাইয়া দিতে হইবে। আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করা নয়।

—শার্ল, দেখ, তোরা এই মাগীকে পাহারা দিবি। আমি পুলিশে খবর দিতে চল্লাম ......

গোদক্রয়ের বুক যেন ভাঙিয়া পড়িবার মতন ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল, ভয়ে ভাবনায় সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। তিনি পুনরায় গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন, ঘোড়া ক্রুদ্ধ পাগলের মতো পুলিশের থানার দিগে ছুটিয়া চলিল। অদৃষ্টের কি পরিহাস! গাড়ীর গদি ভরিয়া চকচকে সব খেলনা পড়িয়া আছে; পথের ধারের সারবন্দি গ্যাসের আলো, দোকানে দোকানে আলোর রোসনাই, ছুটন্ত জানলা দিয়া বার বার [illegible] উপর পড়িয়া হাজার চোখে যেন আ[illegible] এক দেবশিশুর জন্মদিন, আজ বিশেষ ক[illegible] উৎসব, কিন্তু তাঁহার শিশু আজ তাঁহার ঘরে নাই, একথা চারিদিকের পুলক-আয়োজন কিছুতেই তাঁহাকে ভুলিতে দিতেছিল না।

এই উৎসব-প্রমত্ত শহরের পথে পাগলের মতো ছুটিতে ছুটিতে দুঃখে-ম্রিয়মাণ পিতা আপন মনে বার বার বলিতেছিলেন— "আমার রাউল! আমার খোকা!...বাবা আমার! তুই কোথায় গেলি...কোথায় আছিস?" আর অধৈর্য্যে উত্তেজিত হইয়া গাড়ীর গদির উপর আঙুলগুলা চাপিয়া চাপিয়া মটকাইতেছিলেন। আজ এখন তাঁহার কাছে পদমর্য্যাদা, খেতাব সম্মান, কোম্পানির কাগজ, টাকার সিন্দুক, সুদ আসল, সমস্তই মিথ্যা বোধ হইতেছিল। একমাত্র চিন্তা আগুনের শিখার মতো তাঁহার উত্তাল মস্তিষ্কের মধ্যে জাগিতেছিল—আমার খোকা, কোথায় আমার খোকা!

ঐ ঐ পুলিশের থানা। জোরসে জোরসে গাড়ী হাঁকো... রোকো রোকো, গাড়ী রোকো ! ... যাঃ, থানায় যে কেহই নাই, উৎসব-আনন্দে সকলে যে-যার দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।...... কোই হ্যায়, কোই হ্যায় ? ... এই কনেষ্টেবল,এই এই, শোন ... আমি জাঁ-বাপ্তিস্ত গোদক্রয়, সরকারী সুদী কারবারের কর্ত্তা, ... আমার ছেলে, খোকা, শহরের রাস্তায় হারাইয়া গেছে ... চার বছরের খোকা আমার, ... দারোগা সাহেব কাঁহা, দারোগা সাহেব কাঁহা। ...... গোদক্রয় তাড়াতাড়ি কনেষ্টেবলের হাতে একটা মোহর গুঁজিয়া দিলেন।

সেই কনেষ্টেবলটি বৃদ্ধ, প্রকাণ্ড-পাকা-গোঁফ-ওয়ালা ভদ্রলোক ; সে গিনির সুপারিশে যত না হোক বিপন্ন পিতার কাতরতা দেখিয়া তাঁহাকে দারোগা-সাহেবের খাস কামরায় লইয়া গেল। সে ঘরে দারোগা সাহেব এক চোখে চশমা দিয়া পেঁচার মতো গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিলেন।

গোদক্রয় আবেগকম্পিত চরণে ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে নিজের দুঃখকাহিনী বিবৃত করিতে লাগিলেন।

দারোগা সাহেবও ছেলের বাপ ; এই করুণ দৃশ্যে তাঁহার মন গলিয়া গেল। কিন্তু তিনি পুলিশের বড় সাহেব, কোমলতা প্রকাশ করা তাঁহার শোভা পায় না, এইজন্য কষ্টে মনোভাব দমন করিয়া পূর্ব্ববৎ গম্ভীর হইয়াই বসিয়া রহিলেন।

—আচ্ছা, মশায়, আপনি বলছেন চারটের সময় ছেলে হারিয়েছে, না ?

—হাঁ, দারোগা সাহেব।

—হুঁ, তারপরই অন্ধকার হয়ে গেছে ... বয়সও তো তেমন বেশি নয় যে পথ চিনে বাড়ী ফিরবে; লোককেও জিজ্ঞেস করতে পারবে না, কেউ জিজ্ঞেস করলেও জবাব দিতে পারবে না ... এখনো ভালো করে' হয় তো কথাই ফোটে নি, বাপ পিতমর নামও তো সে জানে না, কেমন কিনা ?

—হঁ্যা হঁ্যা দারোগা সাহেব, হঁ্যা !...

—হুঁ, হারিয়েছে মেছোবাজারের দিকে ? ... হুঁ, পাড়াটা বদ বটে, ... গুণ্ডা চোর বাটপাড়ের আড্ডা ঐ মহল্লায়। ... তা আপনি ভাববেন না, ওপাড়ায় খুব হুঁসিয়ার দারোগা আছে... আমি তাকে এক্ষুণি টেলিফোঁ করে বলছি ......

হতভাগ্য পুত্রহারা পিতা পাঁচ মিনিট একলা বসিয়া। কী সে ভয়ানক দুঃসহ সুদীর্ঘ সময়! পাগল হৃদয়ের তখন কী ব্যাকুল আর্ত্তনাদ!

দারোগা সাহেব তাড়াতাড়ি হাসিমুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন —ছেলে পাওয়া গেছে!

ও! আশ্বস্ত পিতার উদ্দাম আনন্দের কী ব্যগ্র প্রকাশ! তিনি দারোগার হাত ধরিয়া আবেগভরে ভাঙিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন।

—আপনার ছেলে পাতলা রকমের ফর্সা ফুটফুটে, কেমন কি না? একটু রোগাটে-রকম চেহারা, না? ... নীল মকমলের পোষাক পরা?—টুপির উপর সাদা পালক দেওয়া, কেমন? ...

—হাঁ হাঁ দারোগা-সাহেব, ঐ আমার ছেলে, আমার খোকা! ...সেই সেই আমার রাউল!

—বেশ বেশ! তা সে ছেলে ঐ পাড়ার একজন গরিব

লোকের বাড়ীতে আছে। সে থানায় এসে এজেহার দিয়ে গেছে! ...হুঁ, এই তার ঠিকানা—পিয়েরো, পাথুরে গলি, রাজার বাগান। গাড়ীতে গেলে এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনি আপনার ছেলে দেখতে পাবেন। তবে আপনি কি সে কদর্য্য জায়গায়, সেই নোংরা গলির কুঁড়ে ঘরে যেতে পারবেন? সে লোকটা তরি-তরকারীর ফেরিওলা! কিন্তু হলে কি হয়, লোক ভালো, নয়?

আ! সে লোক নিশ্চয় খুব ভালো! গোদফ্রয় উচ্ছ্বসিত আবেগে দারোগা সাহেবকে ধন্যবাদ জানাইয়া চার-চারটা করিয়া সিঁড়ি ডিঙাইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন; সে সময় সেই তরকারীর ফেরিওলা সেখানে থাকিলে সরকারী সুদী কারবারের বড়সাহেব তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিতেন। সত্যসত্যই, শ্রীযুক্ত গোদফ্রয়, সরকারী সুদী কারবারের বড় কর্ত্তা, সেই চাষাটার দেখা পাইলে তাহাকে আলিঙ্গন করিতেন! তবে এই লক্ষ্মীর দাস দাম্ভিক ধনীর অন্তরে টাকার মমতা ছাড়া অন্য ভাবও আছে! এই মুহূর্ত্তে তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে তিনি পুত্রকে কি পরিমাণ ভালো বাসেন। কোচমান কোচমান, জোরসে হাঁকো, চাবুক লাগাও! এখন আর তাঁহার অর্থসঞ্চয়ের চিন্তা ছিল না, পুত্রকে রাজপুত্রের ধরণে মানুষ করিয়া তুলিবার কল্পনাও আসিতেছিল না; তিনি ভাবিতেছিলেন বেতনভোগী চাকরদাসীর মিথ্যা মমতার কথা! ভবিষ্যতে তিনি সুদের হিসাবে জবাব দিয়া নিজেই ছেলের খবরদারি করিবেন; তাঁহার বুড়ী পিসির খোঁজ খবর এতদিন তিনি কিছুই লইতে পারিতেন না, এখন তাহাকে আনিয়া বাড়ীতে রাখিবেন—তা হোক সে পাড়াগেঁয়ে।

পিসির পাড়াগেঁয়ে কথার টান আর সেকেলে ধরণে তাঁহাকে সৌখীন মহলে লজ্জা পাইতে হইবে, তা হোক, বুড়ী মানুষ কোথায় একলাটি পড়িয়া আছে, কষ্ট পাইতেছে, তাহাকে দেখাও তো কর্ত্তব্য। আর সে এবাড়ীতে আসিয়া থাকিলে আদর যত্ন করিয়াই তাহার নাতিটিকে প্রাণের টানে মানুষ করিয়া তুলিবে। চাবুক লাগাও কোচমান, চাবুক লাগাও! এই মহাজনের সময়ের টানাটানি রোজই, আর দেনাদার খাতকদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহাকে রোজই তাড়াতাড়ি গাড়ী হাঁকাইতে হয়। কিন্তু আজ টাকা রোজগারের ধান্দা একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেলেও আজ ত্বরার অবধি ছিল না—আজ জীবনে প্রথম তাঁহার সহিত তাঁহার পুত্রের প্রকৃত বাৎসল্যের পরিচয় ঘটিবে। চাবুক লাগাও কোচমান! জোরসে হাঁকাও!

এই কনকনে শীতের রাত্রে সেই গাড়ী সমস্ত পারী শহরের বুকের উপর দিয়া অতিবেগে দীর্ঘপথ পান করিতে করিতে উদ্বেগের মতো ছুটিয়া চলিতেছিল, এবং সরকারী আপিস আদালত, সওদাগরী কুঠি কারখানা, হোটেল সরাই পিছে ফেলিয়া অন্ধকার সরু গলির গোলকধাঁধায় গিয়া পড়িল। একটা নোংরা পাড়ার নোংরা গলিতে গাড়ী থামিল, নাম কিন্তু তাহার রাজার বাগান! শ্রীযুক্ত গোদফ্রয় গাড়ীর লণ্ঠনের আলোকে পথ দেখিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন; দেখিলেন সেখানে এক চত্বর খোলার বাড়ী, ভাঙাচোরা ঝুপসী ছাপ্পর। এই তো সেই নম্বর যে-বাড়ীতে সেই তরকারী-ফিরিওলা থাকে। আবেগ-কম্পিত হস্তে তিনি দরজার কড়া নাড়িলেন। বাড়ীর দরজা খুলিয়া একজন লোক বাহির হইয়া আসিল, সে প্রকাণ্ড লম্বাচৌড়া জোয়ান, তে-এঁটে

তালের মতো তাহার মাথা, আর চৌকো মুখের মাঝে একজোড়া প্রকাণ্ড কটা গোঁফ। সে মুলো, তাহার ডুরে কাপড়ের পশমী জামার বাঁ-হাতটা এক পাশে ঝলঝল করিয়া ঝুলিতেছিল। সে সেই চকচকে গাড়ী আর সুন্দর ওভারকোট-পরা গাড়ীর অধিকারীকে দেখিয়া সানন্দ সম্ভ্রমে বলিল—"আসুন, মশায়, আসুন। আপনি বুঝি ছেলের বাবা? ... কিচ্ছু ভয় নেই ... খোকার কিচ্ছু হয়নি ... সে বেশ আছে।"

সে দরজার এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া আগন্তুককে বাড়ীতে প্রবেশর পথ ছাড়িয়া দিল এবং নিজের মুখের উপর একটি আঙুল রাখিয়া বলিল—"আস্তে মশায় আস্তে! খোকা ঘুমুচ্ছে।"

৩

কুঁড়ে ঘর। সত্যই কুঁড়ে! ঘরের এক কোণে একটা কেরোসিনের কুপি জ্বলিতেছিল—তাহাতে আলো হইতেছিল অল্প, গন্ধ উঠিতেছিল বিষম, এবং ধোঁয়া হইতেছিল প্রচুর। সেই ধূসর আলোয় গোদক্রয় দেখিলেন ঘরের আসবাব একটা পায়া-ভাঙা দেরাজ, খানকতক হাতাভাঙা চেয়ার, একখানা ময়লা গোল টেবিল আর তার উপর রাত্রের সামান্য আহারের উচ্ছিষ্ট বাসন পড়িয়া আছে; দেয়ালের গায়ে দুখানা সস্তা ছাপা ছবি টাঙানো।

কিন্তু সেই মুলো ফেরিওলা তাঁহাকে অধিক কিছু দেখিবার অবসর না দিয়া কুপিটা উঠাইয়া লইয়া ঘরের এক পাশে গেল। সেখানটা একটু আলো হইয়া ওঠাতে দেখা গেল একটি বিছানার উপর দুটি ছেলে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে।

উহারই মধ্যে বড় ছেলেটি ছোটটিকে আদর করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গোদফ্রয় চিনিলেন সেই ছোট ছেলেটি তাঁহারই খোকা রাউল।

ফেরিওলা তাহার চাষাড়ে কথা যথাসাধ্য মোলায়েম করিয়া বলিল—"দুই ছোঁড়াই ঘুমে যেন মরে রয়েছে! আমি ত জানতাম না যে এই ছোট রাজাকে কে কখন খুঁজতে আসবে, তাই আমি ওদের আমার বিছানায় ঘুম পাড়িয়েছি আর ওরা চোখ বুজতেই পুলিশে গিয়ে খবর দিয়ে এসেছি।......অন্য দিনে জিদোর আলাদা ছোট বিছানায় শোয়; আজকে ওদের আমার বিছানায় শুইয়ে আমি জেগে রয়েছি—আমাকে তো ভোরে উঠে গঞ্জের হাটে যেতেই হবে ......"

এত কথা গোদফ্রয়ের কানে গেল কিনা সন্দেহ। তিনি সেই ঘুমন্ত ছেলে দুটিকে দেখিতেছিলেন। উহারা একটা ভাঙা খাটিয়ায় ময়লা বিছানায় তাঁহার ঘোড়ার গায়ের কম্বলের চেয়েও অধম একখানা মোটা কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু তবু এই দৃশ্য কি সুন্দর, কি চমৎকার! রাউল তাহার নূতন চকচকে মকমলের পোষাক পরিয়া ছেঁড়া-কাপড়-পরা তাহার সঙ্গীর কোলের কাছে কেমন স্বচ্ছন্দ নির্ভরের সহিত শুইয়া আছে! রাউলের রক্তহীন ফ্যাকাশে ছোট মুখখানির পাশে এই ছোটলোকের ছেলেটির স্বাস্থ্যসুন্দর কালো কুৎসিত মুখখানিও দর্শনীয় বলিয়া মনে হইতেছিল!

গোদফ্রয় দেখিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ফেরিওলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এটি? তোমার ছেলে?......

—না, মশায়। আমি বিয়ে করি নি, বিয়ে হবারও আর

সম্ভাবনা নেই। দু বৎসর হবে আমার একজন পড়শী মজুরনি, সে মারা গেল; আহা মাগী বড় গরিব ছিল, খেটে খেটে প্রাণ বা'র করত তবু তার আর তার ছেলের পেটভরা খাবার এক বেলাও জুটত না। এমনি করে পাঁচ বৎসর চলল, কিন্তু তার পর তার প্রাণে আর সইল না, সে মারা গেল। মাওড়া ছেলেটি ভগবান আমার হাতেই ফেলে দিলেন,—মায়েদের নিজের বাছারাই খেতে পায় না তা পরের ছেলেকে কি খাওয়াবে, তাই মায়েরাও এই মাওড়া ছেলেটির ভার নিতে পারলে না, তখন ভগবান এই হতভাগার ওপরই ভার দিলেন। এ ভার আমার লাঠির ভারের মতন হয়েছে,—এ আমার অবলম্বন, আমার সহায়, আমার বল ভরসা। এমনি করেই ভগবান তাঁর দেওয়া বোঝা সোজা করে তোলেন। রোজ ইস্কুল থেকে এসে সে তুলদাঁড়ি আর ওজন-বাটখারা মাথায় নিয়ে ঠেলাগাড়িতে তরিতরকারি সাজিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়—আমি এই নুলো হাত দিয়ে যা পারি না, জিদোর তা সহজেই করে দেয়। সাত বছরের ছেলে, কিন্তু এরি মধ্যে ও এমনি চালাক! ও-ই তো খোকাকে কুড়িয়ে পেয়েছিল!

—কি রকম? এই বালক?…

—ওর বড় বুদ্ধি মশায়। ও ইস্কুল থেকে আসবার সময় দেখলে যে খোকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যালফামুখো হয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছে। ও খোকার সঙ্গে ভাব করে চুপ করিয়ে ভুলিয়ে আমার কাছে নিয়ে এল—আমি সেখান থেকে নিকটেই আমার তরিতরকারি ফেরি করে ফিরছিলাম। দেখতে দেখতে আমাদের ঘিরে লোক জমে গেল, আর সবাই কত কি জিজ্ঞাসা

করে' করে' খোকাকে ভরিয়ে তুলতে লাগল। খোকার কথা আমরা কেউ বুঝতে পারলাম না, ভালো করে' একে কথা বলতেই শেখেনি, যা দু একটা বলে তারও কতক ইংরিজি কতক জার্ম্মান। তখন কেউ কেউ বল্লে খোকাকে থানায় দিয়ে আসতে। কিন্তু জিদোর রাজি হল না, সে বল্লে পুলিশ দেখে খোকা ভয় পাবে। আরো, আপনার খোকা জিদোরকে ছেড়ে কোথাও যেতেও চাচ্ছিল না। তখন আমি গাড়ীর বেসাত বাড়ী এনে থুয়ে, খোকাকে জিদোরের কাছে রেখে থানায় খবর দিতে গেলাম। রাত্রে ওরা একসঙ্গে কতকালের চেনা বন্ধুর মতো আনন্দে খাবার খেয়ে ঘুমুচ্ছে; ... খোকাকে কে কখন খুঁজতে আসবে বলে আমি জেগে আছি।

আশ্চর্য্য! শ্রীযুক্ত গোদফ্রয়ের মনে যাহা হইতেছিল তাহা তাঁহার অন্তরাত্মাই জানে। গাড়ীতে আসিতে আসিতে তিনি সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিলেন যে তাঁহার খোকার রক্ষাকর্ত্তাকে বকশিস দিয়া বেশ করিয়া খুসি করিয়া দিবেন—খাতকদের রক্তশোষা সুদের আমদানি হইতে এক মুঠো সোনার মোহর! কিন্তু আজ তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে যে যবনিকা সরিয়া গেল তাহার অন্তরালে দরিদ্রের এ কী জীবন লুক্কায়িত ছিল!—দারিদ্র্যের মধ্যে সততা, দুঃখের মধ্যে আনন্দ, অভাবের মধ্যে আতিথ্য! সেই মজুরনি মাতার সন্তানপালনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা, এই নুলো লোকটির স্বাবলম্বন ও অনাথের প্রতি বাৎসল্য, আর এই ছোটলোকের ছোট ছেলের এতখানি দয়া আর বুদ্ধি সেই ধনকুবেরকে অচিন্তিতপূর্ব্ব ভাবনায় ভাবাইয়া তুলিল। এই যে বালক তাঁহার খোকাকে ছোট ভাইটির মতন বুকে

করিয়া নিশ্চিন্ত আরামে ঘুম পাড়াইয়াছে, অচেনাকে চিরপরিচিত বন্ধুর মতো নিজের খাবারের ভাগ দিয়া নিজের ঘরে রাখিয়াছে, পুলিশের নির্মম হেফাজতে ছাড়িয়া দিতে রাজি হয় নাই, এ তো বকশিসের লোভে মোটেই নয়। তবে শুধু মনিব্যাগের বন্ধ খুলিলেই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইবার নহে—তিনি জিদোর আর তাহার পালকপিতা মুলো ফেরিওলার ভবিষ্যৎ একেবারে নিশ্চিন্ত করিয়া দিবেন, তাঁহার কৃতজ্ঞ সামর্থ্য চিরদিন তাহাদিগের অনুসরণ করিলে তবেই তিনি সন্তোষ লাভ করিবেন। সরকারী সুদী কারবারের বড় সাহেবের মজলিসে যেসব ভাবুকতাহীন মহাজনদের দহরম-মহরম, তাহারা তাহাদের আদর্শ এই বড় সাহেবের মনের এখনকার অবস্থা জানিতে পারিলে নিশ্চয় খুব আশ্চর্য্য হইয়া যাইত। বাস্তবিক সুদী কারবারের বড়কর্ত্তা আজ তাঁহার জীবনের এক নূতন অধ্যায়ের পরিচয় দিলেন, তিনি সদাশয় আন্তরিকতা মুক্ত করিয়া ধরিতে উদ্যত! সত্যই তিনি এই দরিদ্র ছোটলোককে বকশিস দিতে গিয়া টাকার থলির বন্ধ না খুলিয়া একেবারে হৃদয়ের বন্ধ খুলিয়া দিতে প্রস্তুত! এই মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে হইল এই ফেরিওলা ছাড়া জগতে আরো অনেক দরিদ্র পঙ্গু আছে, জিদোর ভিন্ন অনেক অনাথ শিশু আছে, অনেক মাতা সন্তানপালন করিবার সংগ্রামে নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে। আরো আশ্চর্য্য যে, তাঁহার মনে হইল অর্থ যদি অভাবই মোচন না করিল তবে তো সে অর্থ নয়, ব্যর্থ,—সে ধাতু, খনির মধ্যে থাকিলেও যা সিন্দুকে পড়িয়া পচাও তা। এই সব চিন্তা তাঁহাকে উতলা করিয়া তুলিতে লাগিল।

ঘুমন্ত দুটি শিশুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পুত্রহারা পিত

এইরূপ চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছিলেন। অবশেষে যখন চমক ভাঙিয়া ফেরিওলার মুখের দিকে তাকাইলেন তখন তাহার বিনয়নম্র স্বাধীন ভাব আর আনন্দে উজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

গোদফ্রয় বলিলেন—ভাই, আজ থেকে তোমরা আমার বন্ধু। তুমি আর তোমার পোষ্যপুত্র আমায় উপকার দিয়ে কিনে নিয়েছ··· আমিও দেখাব যে আমি অকৃতজ্ঞ নই ...... বন্ধু, আজ থেকেই ······ বন্ধু, আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমার অবস্থা সচ্ছল নয়, ...আমি তোমায় আমার কৃতজ্ঞতার প্রথম নমুনা দেখাতে চাই ···

ফেরিওলা তাহার একখানি হাত দিয়া বড়সাহেবের নোটের-তাড়া-ভরা হাত ঠেলিয়া ধরিয়া বলিল—না, না, মশায় না ওসব হবে না। আমরা পাবার প্রত্যাশা করে কিছু করি নি; আপনি কিছু মনে করবেন না, আমরা কিছু নিতে পারব না। আমরা সোনাদানার মুখ দেখিনি বটে, কিন্তু এমন দিন আমার চিরকাল ছিল না। আমি সৈন্য ছিলাম, আমার এখনো মেডাল আছে; তারপর আমি কারিগর মিস্ত্রী ছিলাম; হাতের উপর দিয়ে একদিন গাড়ী চলে গিয়ে আমায় অকর্ম্মণ্য নুলো করে দিয়ে গেছে, কিন্তু তবু এখনো আমি নিজের রোজগারই খাচ্ছি, কারু এক পয়সার ধার ধারিনে।

—তবু·········

সেই নুলো ফেরিওলা গোদফ্রয়ের কথার আরম্ভেই সরল হাস্যে তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—তবু যদি আপনি আমায় দয়া করবেনই, তবে এই গরিবকে স্মরণ রাখবেন, তা হলেই যথেষ্ট হবে।

অর্থপিশাচ কুচক্রীর কাছে আজ এসব কী বিস্ময়কর ব্যাপার! সুদী কারবারের বড়সাহেব আজ একটা মুলো ফেরিওলার কাছে একেবারে অবাক হতভম্ব এতটুকু!

গোদক্রয় আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু জিদোর, জিদোরের জন্যে আমায় কিছু করতে দাও।

ফেরিওলা আনন্দে উত্তর করিল—ওর জন্যে? আহা ও অনাথ। আমি অনেক সময় ভাবি যে আমি ছাড়া জগতে ওর কেউ নেই, তখনই আবার ভাবি, ভাবনা কি, আমাকে যিনি জুটিয়ে দিয়েছেন, তিনিই আবার কাউকে জুটিয়ে দেবেন ··· ইস্কুলের মাষ্টারেরা তো ওকে বড়ই তারিফ করেন, ভালো বাসেন। ...

সে হঠাৎ থামিয়া গেল। তারপর বলিল—আপনি অনেকক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে আছেন—খোকাকে গাড়ীতে নিয়ে চলুন ······ ও অঘোরে ঘুমুচ্ছে এখন কোলে নিলে জাগবে না, ······ দাঁড়ান, আগে ওর পায়ে জুতো জোড়া পরিয়ে দি, ঠাণ্ডা লাগবে······

ফেরিওলার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া গোদক্রয় দেখিলেন যে অগ্নিকুণ্ডের ধারে দুজোড়া ছোট ছেলের জুতা রহিয়াছে—চকচকে নূতন জোড়া রাউলের, আর নালবাঁধানো ছেঁড়া নাগরা জোড়া জিদোরের, আর ফি জুতার মধ্যে দু-পয়সানে এক একটা পুতুল ও এক এক মোড়ক মেঠাই আছে।

ফেরিওলা লজ্জিত হইয়া বলিল—ওদিকে দৃষ্টি দেবেন না মশায়; ওসব জিদোরের কাণ্ড! শোবার আগে নিজের জুতোয় আর আপনার খোকার জুতোয় ঐসব বড়দিনের সওগাত রেখে তবে সে ঘুমুতে গেছে ... আমি থানায় খবর দিয়ে ফেরবার পথে ঐসব ছাইপাঁশ কিনে এনেছিলাম ছেলে ভুলোতে ······

বড়সাহেব ভাবমুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার স্তাবকেরা তখন দেখিলে তাঁহাকে চিনিতে পারিত কিনা সন্দেহ। গোদফ্রয়ের চক্ষুতে আজ জল!

হঠাৎ তিনি সেই খোলার ঘরের গলি হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং মিনিট খানেক পরে আবার ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার দুই হাত তখন নানা খেলনায় ভরা—এগুলি তিনি নিজের খোকার জন্য কিনিয়াছিলেন, এতক্ষণ গাড়ীতেই অযত্নে গড়াগড়ি যাইতেছিল। তিনি সেইসব সোনালিবার্নিশ-করা চকচকে খেলনা সেই ছোট দুজোড়া জুতার মধ্যে ভাগ করিয়া রাখিয়া দিলেন। ফেরিওলা অবাক হইয়া তাঁহার কাণ্ড দেখিতে লাগিল।

গোদফ্রয় ফেরিওলার হাতখানি নিজের আবেগব্যগ্র হাতের মধ্যে দৃঢ় করিয়া ধরিয়া ভাবগদ্গদ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—বন্ধু, আমার বন্ধু, এইসব খেলনা বড়দিন বুড়ো খোকাদের জন্যে নিয়ে এসেছে। আমার ইচ্ছে যে রাউল জিদোরের সঙ্গে জেগে তার বন্ধুর সঙ্গে একত্র খেলনা পাওয়ার আনন্দ ভাগ করে নেবে।... রাউল আজ তোমার বাড়ীতেই থাক।...... আজ থেকে বন্ধু, তোমরা আমার আপনার, তোমাদের ভার সে আমার। আজ তোমরা আমায় শুধু আমার হারাণো ছেলে ফিরে দিলে না, আমার হারাণো মনুষ্যত্বও ফিরে দিলে। আমি এই দুটি ঘুমন্ত শিশুর শপথ ক'রে বলছি একথা আমি জন্মে ভুলব না! ......

নীলকুঠি

আমার কাকা জাঁ তাঁহার জীবনের এই কাহিনীটি আমাদের কাছে বলিয়াছিলেন—

তোমরা তো জানোই টাকার ধান্দায় আমাকে ফ্রান্সের চারিদিকেই ঘুরে বেড়াতে হ'ত। একবারকার যাত্রায় দিজোঁ এলাকার কাছাকাছি একটা নেহাত পথের বাহির জায়গায় একটা ছোট ষ্টেসনের ধারে একখানি অদ্ভুত ধরণের ছোটখাটো বাড়ী দেখেছিলাম।

সেই বাড়ীখানির রং ফিকে নীল; বৃষ্টিবাদল ঝড়ঝাপট খেয়ে খেয়ে ফিকে রং আরো ফিকে হয়ে ছাতের ধূসর রঙের সঙ্গে প্রায় একাকার হবার উপক্রম হয়েছে।

প্রথমবারে যখন আমি সেই বাড়ীখানি দেখি—সে আজ প্রায় চল্লিশ বছরের কথা—সে রেলগাড়ীর কামরা থেকে বসেই; গাড়ী তখন সেই ছোট্ট ব্লেজি-বা ষ্টেসনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই নীল কুঠির সামনের ছোট্ট বাগানটিতে একটি বালিকা লাটিম ঘুরিয়ে খেলা করছিল—তার বয়েস দশ বছরের কাছাকাছি, ফুটফুটে গোলাপী তার রং, পোষাকটি তার বসন্তের সজ্জার মতো, আর তার রেশমী চুলগুলি একটি নীল রেশমী ফিতার ফাঁশে বাঁধা, সর্ব্বাঙ্গে তার উচ্ছল আনন্দের ঢেউ,—আনন্দেরই প্রতিমা সে!... সেদিন সকালবেলাটায় আমার মেজাজটা খুসি ছিল না; আমার কারবারটা ঠিক চলছিল না, তাই আমি বদমেজাজে চিন্তার বোঝাই নিয়ে পারী শহরে ফিরে যাচ্ছিলাম। ...... এই ক্ষণিকের ছবিখানি

আনন্দের প্রলেপ দিয়ে আমার মনের সকল গ্লানি মুছে দিলে। আজ প্রভাতে নয়ন মেলেই এই প্রকৃতিসুন্দর কুণো দেশের সাজানো বাগানে সুন্দরী বালিকার মাধুরী দেখেই মনে হল, আজকের দিনটা আমার ভালোয় ভালোয় যাবে। আমি ভাবলাম—"এমন জায়গায় যারা বাস করে তারা নিশ্চয় খুব সুখী!......না আছে তাদের চিন্তা, না আছে তাদের বিরক্তির কোনো কারণ।" আর সেই আনন্দপ্রতিমা মেয়েটির সরলতা দেখে আমার হিংসে হতে লাগল। যদি আমি তারই মতো আমার ভাবনার বোঝা নামিয়ে ফেলে বিশ্বসৌন্দর্য্যের লীলার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারতাম!

গাড়ী ছেড়ে দিলে। ঠিক সেই সময়ে নীলকুঠির একটা জানলা খুলে একজন কে ডাকলে—"লোরিন্!"......আর অমনি ছোট্ট মেয়েটি বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

লোরিন্! এই নামটিও আমার কাছে বড় মিঠা লাগল। এবং গাড়ীতে নিষ্কর্ম্মা বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমি কল্পনার চক্ষে দেখতে লাগলাম সেই লোরিন, সেই লাটিম, সেই বাগান, আর সেই নীলকুঠি। ক্রমে ক্রমে সব ঘোলা হয়ে ঝাপসা হয়ে এল, কুঠি বাগান লাটিম লোরিন সব আমার ভাবনার মধ্যে একশা হয়ে গেল।

তারপর অনেক দিন ওমুখো আর হইনি। ফ্রান্সের উত্তর থেকে পূর্ব্ব, কথনো লীল, কথনো বা ন্যান্সি অন্নচেষ্টায় ছুটোছুটি করে ফিরছিলাম, মাথায় আমার দোসরা চিন্তার অবসর আর ছিল না।

প্রায় দশ বৎসর পরে। একদিন শুভদিনে আমি মার্সেঞ্জী

যাত্রা করলাম। সেখানকার কাজ সেরে ফেরবার মুখে আমার পুরোণো স্মৃতি জেগে উঠল। আমি বুঝে শুনে সন্ধ্যার গাড়ীতে রওনা হলাম, যেন ব্লেজি-বা ষ্টেসনে গিয়েই আমার সুপ্রভাত হয়।......সেই নীলকুঠি ঠিক তেমনি আছে, বরং মনে হল রংটি যেন আরো ফিকে হয়ে গেছে, আর যেন কুঠির দিকে কারো বেশি নজর নেই।......কিন্তু সেই বাগানে একটি তরুণী বসে ছিল, সুন্দরী গৌরী, তার চুলগুলি আজ তার মনেরই মতন গোলাপী ফিতায় বাঁধা।......এই তো সেই লোরিন্, আমি যে তাকে চিনি! তার পাশে একজন তরুণ বসে ছিল—সমস্ত প্রাণ দিয়ে যেন সে লোরিনকে দেখছিল, লোরিনের তুষ্টির জন্যে সে যেন আপনাকে পলকে পলকে নিবেদন করে দিচ্ছিল; আর তাদের দুজনকে ঘিরে সেই সরল হাসি আর মনের শান্তি তেমনি ভাবেই বিরাজ করছিল।

তাদের সেই তরুণ হৃদয়ের ভাববিগলিত মিলনদৃশ্য দেখে আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যখন ট্রেন ছাড়বার সঙ্কেতঘণ্টা বেজে উঠল আমি তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাত দুলিয়ে মাথা নেড়ে অভিবাদন করে চেঁচিয়ে বললাম—নমস্কার নমস্কার কুমারী লোরিন!......আজকে তবে আসি...

তরুণী আমার দিকে বিস্ময়ে-বিকশিত কুরঙ্গ-নয়ন তুলে চাইলে, সঙ্গে সঙ্গে সেই তরুণও। তারপর তারা দুজনে হাসিতে যেন গলে' ঝরে পড়তে লাগল; তারাও নমস্কার করে' তাদের রুমাল দুলিয়ে আমায় প্রত্যভিবাদন করলে।......আমি গাড়ীর জানলায় মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে সব দেখলাম।......আমার মন খুসি হয়ে গেল।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে, মার্সেঈ লাইনে অনেকবার যাওয়া-আসা করেছি বটে কিন্তু কাজের তাড়ায় এমন গাড়ীতে যেতে আসতে হয়েছে যে-ট্রেন গভীর রাত্রে ব্লেজি-বা ষ্টেসনে না থেমেই পেরিয়ে যায়। একবার সুবিধামত সন্ধ্যার গাড়ীতেই যাওয়া ঘটল, সেই যে-গাড়ী ঠিক সকাল বেলায় ব্লেজি বা ষ্টেসনে পৌছয়। সে আজ কতদিন যেদিন সেই বাগানে লোরিনকে তার প্রণয়ীর পাশে দেখেছিলাম? বারো বচ্ছর, পনর বচ্ছরই বা; আমার ঠিক মনেও নেই।......

এবার ট্রেন যখন সেই ছোট্ট ষ্টেসনে এসে থামল, দেখলাম সেই বাগানে কেবলমাত্র একটি ছোট ছেলে ঘাসের উপর শয়ান একটা প্রকাণ্ড কুকুরকে ধরে' টানাটানি করে' খেলা করছে।... তবে কি আমি লোরিনকে একবার দেখতে পাব না?......আমি বড়ই ক্ষুণ্ণ মনে হতাশ হয়ে পড়ছিলাম। হঠাৎ ছেলেটি চেঁচাতে লাগল—মা!......মা!......রেলগাড়ী!......কলের গাড়ী! ...

তখন একজন মহিলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। ... এই সেই, নিশ্চয়! একটু মোটা, একটু কালো, কিন্তু তবু আমি তাকে দেখবামাত্র চিনেছি। তাকে দেখবামাত্র আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে আমি টুপি তুলে তাকে অভিবাদন করলাম।··· সেও আমার অভিবাদন প্রত্যর্পণ করলে, কিন্তু একটু বিস্ময়ের ভাবে। ... সে চিরদিনই সেই একই রকম আছে,তেমনি প্রিয়দর্শন, তেমনি সরল, তেমনি ঠিক তারই মতন! ... গাড়ী যখন ছাড়ল, তখন আমার এই আগমনটিকে চিহ্নিত করে রাখবার জন্যে একটা কমলা লেবু নিয়ে ছেলেটির উদ্দেশে বাগানের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিলাম; কমলা লেবু ঘাসের উপর গড়িয়ে গেল

আর তার পিছনে পিছনে ছেলেটি আর কুকুরটি দৌড়তে লাগল।...

এর পরের আমার জীবনে এমন সব বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল, যে, আজ এত বৎসর পরে সেসমস্ত যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়। তোমরা জানো ব্যবসা উপলক্ষ্যে তুর্কে গিয়ে কালাপানিতে আমার জাহাজ-ডুবি হয়েছিল। তখন সেই দুরবস্থায় পড়ে সেই ব্লেঞ্জি-বা ষ্টেশনের ধারের সেই নীলকুঠির কথা আমার মনে পড়েছিল কি না তোমরা ভাবছ? ...... মনে পড়েছিল বৈ কি! সেই জাহাজ-ডুবির পর মৃত্যু আর আমার মধ্যে যখন একখানি তক্তামাত্র ব্যবধান, তখন ঠিক সেই প্রথম দিনের মতনই হুবহু সমস্ত চিন্তা আমার মনের উপর দিয়ে বুলিয়ে বুলিয়ে যাচ্ছিল।... আমি তখন নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলছিলাম—হায়রে হতভাগা জাঁ! পৃথিবী ঘুঁটে দৌড়ে বেড়ানোর মজাটা তো এবার টের পেলি। যদি তুই অল্পে সন্তুষ্ট হতে জানতিস তা হ'লে হয় তো তুইও তোর অচেনা বন্ধু লোরিনের মতোই শান্তিতে থাকতে পারতিস, চাই কি বুরগঞ্জের রৌদ্রতপ্ত সেই নীলকুঠির কোলেই ঠাঁই পেতিস। আজ আর সেসব সুখের সম্ভাবনাও তুই রাখিস নি!

ভাগ্যে ভাগ্যে আমি সেবার বেঁচে গেলাম। সে যেন দৈব ঘটনা। আমি যখন অবসন্ন মৃতপ্রায় তখন এক ওলন্দাজ জাহাজ দুদিন পরে আমায় জল থেকে তুলে নিলে।... পনর কি কুড়ি দিন পরে, ঠিক মনে নেই, আমি আবার ফ্রান্সে ফিরে এলাম। দেশে ফিরেই আমি মার্সেঈ থেকে পারী শহরের ট্রেনের যাত্রী হলাম। এই আমার শেষ যাত্রা। এই বুড়ো বয়সে

এত নাকালের পর টো টো করে ঘুরে বেড়াবার সাধ আর আমার ছিল না।

সকাল বেলা গাড়ী সেই ব্লেজি-বা ষ্টেসনে পৌছল। আমার হৃদয় যেন আনন্দে উদ্বেগে ফেটে পড়বার মতন হয়ে উঠল, হৃদয় যেন বক্ষপঞ্জর ভেঙে চুরে লোরিনকে একবার দেখবার জন্যে ছুটে বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছিল। এখনি গাড়ী থামবে আর ছেড়ে চলে যাবে, একটি মুহূর্ত্তের মাত্র সুযোগ, হয়তো তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হবে না।

গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে দূর হতেই দেখতে পেলাম ষ্টেসনের পাশেই সেই নীলকুঠি রৌদ্র মেখে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।... হঠাৎ রৌদ্র-মাখা নীলকুঠি দেখে আমার কেমন কালাপানিতে নৌকা-ডুবির কথা মনে এল। ... সে আজও এই বাড়ীতে আছে, হয় তো তেমনি শান্ত উদাসীন, আমার ভরাডুবির খবরও সে রাখে না। ... গাড়ী এসে ঠিক কুঠির সামনেই থামল। আমি দেখলাম সেই বাগানের একটি লতাবিতানের নীচে একজন বর্ষীয়সী রমণী বসে রয়েছে—তার রূপালি চুলগুলি সীথিতে দুভাগ হয়ে ছড়িয়ে গেছে, আর তার চারিদিকে ঘিরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কলরব করছে।

এই লোরিন্! ... তাকে আর কেউ চিনতে পারত না; আমি কিন্তু তাকে চিনি! ... এক মুহূর্ত্তেরও দ্বিধা আমার হয় নি। —সেই বালিকাবয়সে লাটিম নিয়ে তার খেলা; তার পর তারুণ্যের লীলাচপল সেই সাক্ষাৎ; তারপর সে গৃহিণী, সে মাতা; আর আজ সে ঠাকুর মা, দিদিমা, নাতিনাতিনী-পরিবৃতা; বার বার বিভিন্ন মূর্ত্তি, কিন্তু সকল মূর্ত্তিই সেই এক অভিন্নের!

এবারকার এই ক্ষণিক সাক্ষাতের আসন্ন অবসান আমার চিত্ত দুঃখ বেদনায় ভরে তুলতে লাগল। আর আমি এ পথে কখনো আসব না, এই আমার এজন্মের শেষ সাক্ষাৎ! আমার বড়ই সাধ হতে লাগল আমি একটিবার অল্পক্ষণের জন্যে কথা কয়ে আমার চল্লিশ বছরের পুরাতন অচেনা বন্ধুটির কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে যাই। ... দৈব আমার সহায় হ'ল; এঞ্জিনটা অল্প বিগড়ে গেল; অন্তত পক্ষে ঘণ্টাখানেক লাগবে কল সারতে; ততক্ষণ সেই ষ্টেসনেই থাকতে হবে। ... আর আমায় পায় কে? সাধ আমি মেটাব। আমাদের এই বৃদ্ধ বয়সে সঙ্কোচের তো কোনো কারণ নেই।

আমি কুঠির ফটকের দিকে চললাম; আমার পা কিন্তু তখন থরথর করে কাঁপছিল। ভাবের আতিশয্যে এমন অভিভূত আমি কস্মিন কালেও হই নি। আর, আমি যা হই তা হই ভীরু নই, এটা ঠিক, তার উপর তো তুর্কীর দেশে বিষম রকম তুর্কী নাচন নেচে এই সদ্য আসছি।...যাক!...আমি ডাক-ঘণ্টার দড়ি তো টেনে দিয়েছি! ... মালী এসে দরজা খুলে দিলে; আমি তাকে বললাম—"ঐ যে লতাঘরে বুড়ীগিন্নি বসে রয়েছেন আমি একবার তাঁর সঙ্গে কথা কইতে চাই।"...মালী আমাকে বাগানে ঢুকিয়ে গিন্নিকে ডাকতে গেল ......সে এল।......

এতদিন পরে লোরিন আজ আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু আমি তাকে বলবার মতন কোনো কথাই এখন খুঁজে পাচ্ছি না। সেই তখন আমায় জিজ্ঞাসা করলে—"আপনার সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার কিসে হ'ল মশায়?"

ভয়ে ভয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি আমায় চিনতে পারছ না ?"

—কৈ না তো......

—আ ! আমি, আমি কিন্তু তোমায় খুব চিনি !......ভেবে দেখ !......আমি যে তোমায় চিনেছি সে কি আজকের কথা ?... আমি তোমাকে এই বাগানে এতটুকু বেলায় লাটিম নিয়ে খেলা করতে দেখেছি ; আমি সেই লোক, তোমার নিশ্চয় মনে আছে, যে গাড়ীর জানলা থেকে তোমায় একদিন নমস্কার করে গিয়েছিল—তখনো তোমার বিয়ে হয়নি ; আর তারপর, অনেক দিন পরে যে লোক একটা কমলা লেবু একটি ছোট...

সেই মহিলাটি কেমনতর ভয় পেয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল ; প্রথমটা কয়েক পা পিছিয়ে হটে গিয়ে দাঁড়াল ; আমায় হয় তো পাগল কি মাতাল ঠাউরে থাকবে ; কিন্তু তারপর আমার বৃদ্ধ বয়সের শান্ত মূর্ত্তি দেখে ভরসা করে খুব কোমল শান্ত স্বরে বললে —"আপনার নিশ্চয় কোনো রকম ভুল হয়ে থাকবে। আমরা সবে এই এক বচ্ছর এই নীলকুঠিতে আছি।"

আমি অবাক হয়ে গেলাম।—আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি......তবে......লো......রি......ন......নন ?"

—লোরিন ?......আপনি মশায় কার কথা কচ্ছেন আমি তো ঠিক বুঝতে পারছিনে। আমাদের এখানে তো সে নামের কেউ নেই।

আমার মনে হতে লাগল যেন আমার চারিদিকে স্বপ্নের ঘোর লেগেছে। যখন সেই মহিলা চলে যাবার উপক্রম করলেন তখন আমি বল্লাম—ক্ষমা করবেন......আর একটি প্রশ্নের

জবাব দিয়ে যান।......আপনাদের আগে এ বাড়ীতে কাঁ'রা থাকতেন ?

—আমাদের আগে ?......একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, চিরকুমার তিনি। দশ বচ্ছর হল তাঁর মৃত্যু হয়েছে।......

তিনি খুব ঘটা করে' নমস্কার করে' আমাকে ফটকের বার পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফটক বন্ধ করে দিলেন। আমি একেবারে আস্ত একটি বোকা বনে' গিয়ে ব্লেজি-বা গাঁয়ের গলি দিয়ে চলছিলাম, বিষম দুর্ঘটনার দুঃখে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল।... আমাকে তল্লাস করে জানতেই হবে··· নিশ্চয় আশ্চর্য্য রকম একটা ভুল এর মধ্যে জড়িয়ে আছে, সে জট সন্ধান করে খুলতেই হবে।

আমি ষ্টেসন-মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে ভদ্রলোক কিছুই জানেন না, এ ষ্টেসনে তিনি নবাগত। কিন্তু তিনি সন্ধান বলে দিলেন যে এই গাঁয়ের সবার চেয়ে বুড়ো একটি লোক ষ্টেসনের কাছেই নীলকুঠির সামনেই থাকে, তার কাছে খবর মিলতে পারে।

বৃদ্ধ চিন্তাসূত্র গুছিয়ে নিতে নিতে বললে—লোরিন...অ্যাঁ, লোরিন...আমার তো স্মরণ হয় না...

—কিন্তু বছর পনর ষোল আগে ঐ বাগানে যে একজন মহিলাকে দেখেছিলাম একটু মোটা একটু কালো, একটি ছোট ছেলে আর একটা প্রকাণ্ড কুকুরের সঙ্গে...সে তবে কে ?...

—ও ! একটা বড় কুকুর, অ্যাঁ, একটা খুব বড় কুকুর...হ্যাঁ হ্যাঁ, সে যে দারোগা-গিন্নি মাদাম জিলামে। কিন্তু তার নাম তো

লোরিন ছিল না, এ তো আমি খুব জানি, আমি যে বরাবর তাদের বাড়ীতেই থাকতাম। তার নাম ছিল ফ্রাঁসোয়াজ।

আমি তো একেবারে মূঢ়ের মতন হয়ে গেলাম।

— আচ্ছা, মশায়, ভালো করে মনে করে দেখুন তো···আচ্ছা, তারো আগে, প্রায় বছর বারো আগে, একজন যুবতী মেয়ে খুব ফরসা, বেশ লম্বা, মাথার চুলে গোলাপী ফিতে বাঁধা, আর একজন কালো মতো যুবা পুরুষ, খুব সম্ভব সেই মেয়েটির বাগ্‌দত্ত স্বামী, এই বাগান-বাড়ীতে কি থাকত ?...

বৃদ্ধ ভাবলে, ভাবলে, কতক্ষণ ধরে ভাবলে।··· অবশেষে সে তার বুড়ীকে ডাকলে। বুড়ী, মানুষটি ছোটখাটো, চোখ দুটি উজ্জ্বল জীবন্ত, চটপটে ধরণের, দেখলেই মনে হয় যে তার স্মরণশক্তি বেশ তেজালো। বুড়ো তাকে সব কথা বললে।...

—ও! সে যে মাদমোয়াজেল স্তেফানি, কণ্ট্রাক্টার সাহেবের মেয়ে, ...সেই তো লম্বা মতন, চুলে ফিতে বাঁধা...এ সে বৈ আর কেউ নয়! ... দিজোঁশহরের এক সওদাগরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, আহা বেচারা! তাদের বিয়ে সুখের হয় নি, তারা আলাদা হয়ে আছে। আহা, মেয়েটা এখন, ঐ যে কি বলে ভালো ওর নামটা, ঐ সোম্‌ব্যারনোঁ শহরে তার বাপের বাড়ীতেই আছে, আহা বড় দুঃখ তার ······

আমি যাবার জন্যে নমস্কার করলাম।... সময় আর নেই, ট্রেন এইবার ছাড়বে···

—লোরিন্! লোরিন্! সে তো একেবারে ভ্রান্তি নয়, আমি যে তাকে এতটুকু বেলায় দেখেছি, আমি যে তার নাম শুনেছি··· আজও যেন তাকে চোখের সামনে দেখছি সে বসন্তের প্রজা-

পতিটির মতন হাওয়ার গানে আলোর তালে পুষ্পগন্ধের সুরে লাটিম ঘুরিয়ে নেচে খেলে বেড়াচ্ছে...

এই কথা না শুনে বুড়ী বলে উঠল—ও! এ কথা আগে বলতে হয়, মশায়।...আপনি আগে বললেন একজন গিন্নির কথা, তারপর বল্লেন একজন সোমত্থ মেয়ের কথা, ... এখন বলছেন একটি ছোট মেয়ের কথা! ... হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাকে তো আমার বেশ মনে আছে, ... লোরিন, ... হ্যাঁ, লোরিনই তো তার নাম বটে। ... উঃ, সে কি আজকের কথা গো, নেই কম তো দুকুড়ি বচ্ছর হবে! ... সেই ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি তো ... সে ডাক্তার সাহেবের মেয়ে, আমাদেরই তারা আপনার লোক। ... আহা মেয়েটা দশ বচ্ছর বয়েসেই মারা গেল!...

দশ বৎসর বয়সে, আমি তাকে দেখার কয়েক দিন পরেই, সে মারা গেছে! আর আমি? আমি তার পর এই চল্লিশ বৎসর ধরে তাকে অনুসরণ করে আসছি!...

গোঁপ-খেজুরে

কুড়েমির বাথান আর আরাম-আয়েসের আড্ডা ছিল সেই ব্লিদা শহরটি। সেখানে একজন মুর ভদ্রলোকের বাস ছিল,—বাপে মায়ে তাহার নাম রাখিয়াছিল সিদি লাকদার, আর শহরের সবাই তাহার নাম রাখিয়াছিল 'আলসে কুড়ে'।

পৃথিবীর মধ্যে অল্‌জেরিয়া কুড়েমির জন্য নামজাদা; তাহার মধ্যে ব্লিদা শহরটি বিশেষ; আর তাহার মধ্যে সিদি লাকদার

সবিশেষ। এই মহামহিমান্বিত ব্যক্তিটি আলস্যকেই নিজের আসল পেশা করিয়া তুলিয়াছিল ;—অন্য লোকের কেউ দরজি কেউ বা ভিস্তি কেউ বা সরাইখানার বাবর্চি, কিন্তু সে, সিদি লাকদার, আলসে কুড়ে ;—এতেই তাহার গৌরব !

পিতার মৃত্যুর পর সিদি লাকদার ওয়ারিস-সূত্রে একখানি বাগান-বাড়ীর মালিক হইল। সংসার অসার ও অনিত্য, এখানে মেহনত করা মিথ্যা—এই মহাতত্ত্বটি সিদি লাকদারের বেশ মালুম হইয়াছিল। সে হাত পা এলাইয়া বাড়ীর মধ্যে পড়িয়া থাকাটাই উপযুক্ত মনে করিল। তাহার কুড়েমির তাড়সে অল্পদিনের মধ্যেই অতি সহজে বাড়ীটির দেহ মাটিতে মিশাইল ; বাগানের চুনকামকরা নীচু প্রাচীরটিও খসিয়া খসিয়া এলাইয়া পড়িতে লাগিল ; বাগানের দরজা আগাছার আক্রমণে আটক হইয়া অচল হইয়াই রহিল ;—কুড়েমির এমনি ছোঁয়াচে মহিমা ! বাগানে বাঁচিয়া রহিল এত অযত্নেও গোটাকত আঞ্জীর আর খেজুর গাছ, আর ঘাসের মাঝে গোটা দুই তিন ঠাণ্ডা জলের নহর। বাড়ী যখন দেহত্যাগ করিল, তখন নির্বিকারচিত্তে সিদি লাকদার আসমানের সামিয়ানার তলে ঘাসের ফরাশের উপর হাত পা ছড়াইয়া অনড় অচল নির্বাক জড় পড়িয়া পড়িয়া জীবনের মেয়াদ কাটাইয়া দিবে সঙ্কল্প করিল।

ক্ষুধা লাগিলে সিদি লাকদার হাতড়াইয়া এক আধটা পাকিয়া-পড়া আঞ্জীর কি খেজুর মুখে তুলিয়া অতি কষ্টে নাচার ভাবে গিলিয়া ফেলিত ; ক্ষুধা তৃষ্ণায় মরিবার মতন হইলেও গা তুলিয়া আপনার এত কষ্টের অর্জ্জিত নাম হাসাইত না। বাগানে আঞ্জীর আর খেজুর, গাছে পাকিয়া গাছেই শুকাইত ; ছোট ছোট

পাখীর ঝাঁক ফললোভে গাছে কলরব করিত, ঝটাপটি করিত, তাহাতেই যে দুই চারিটা পাকা ফল খসিয়া ঝরিয়া পড়িত তাহাই সিদি লাকদারের ভোগে লাগিত; আর লাল ক্ষুদি পীঁপড়ে মিষ্ট রসে আকৃষ্ট হইয়া তাহার বিপুল দাড়ির কাঁদির ভিতর গাঁদি লাগাইত।

এই অপূর্ব্ব রকমের বাদশাহী কুড়েমি লাকদারকে দেশবাসীর কাছে সমাদৃত সম্মানিত করিয়া তুলিয়াছিল। দেশে তাহার খ্যাতি আর খাতির সাধু সন্ত নবী পয়গম্বরের চেয়ে কম ছিল না। তাহার আস্তানার সম্মুখ দিয়া কেহ ঘোড়ায় চড়িয়া যাইত না, তাহার আস্তানার কাছাকাছি আসিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া পথিক পদব্রজে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া চলিত; এমন কি তাহার আস্তানার কাছে শহুরে মেয়েরাও ঘোমটা টানিয়া চাপা গলায় ঝগড়া করিত; মকতব মদরসার পড়ুয়ারা পাঠশালার ছুটির পর ক্ষুধা খেলা বাড়ীঘর সব ভুলিয়া ডুরে ছিটের চাপকান আর লাল লাল টুপি পরিয়া উৎসুক কৌতুকে তীর্থযাত্রীর মতো দলে দলে আসিয়া পাঁচিলের উপর চড়িয়া এই মহাপুরুষকে দর্শন করিত।

ছোঁড়ারা কিন্তু এই মহাপুরুষের মর্য্যাদা অধিকক্ষণ রক্ষা করিতে পারিত না; তাহারা তাহার নিশ্চল শয়ন লক্ষ্য করিয়া হাসিত, নাচিত, কলরব করিয়া হাততালি দিত, লাকদারের আটপৌরে ডাকনাম ধরিয়া ডাকিত, নেবু খাইয়া তাহার খোসা ছুড়িয়া তাহাকে মারিত। পণ্ডশ্রম! আলসে কুড়ের নড়নও নাই চড়নও নাই। মাঝে মাঝে সে ঘাসের ভিতর হইতে অতি কষ্টে গেঙাইয়া শাসাইত বটে "রোস ত ছোঁড়ারা, আমি যদি উঠি তো..." কিন্তু ওঠা তাহার কখনো ঘটিয়া উঠিত না।

ভবিতব্যের লিখন আর খোদাতালার মর্জ্জি, পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে একটা ছোঁড়ার উপর আল্লার নেকনজর পড়িল,—তাহার মনে হঠাৎ খেয়াল হইল যে সিদি লাকদারের মতন সেও সটান শুইয়া জীবনটাকে ফাঁকি দিয়া ফুকিয়া দিবে। সকাল বেলা উঠিয়া সে বাপের কাছে এত্তেলা করিল যে সে অতঃপর আর পাঠশালের চৌহদ্দি মাড়াইবে না, সে আলসে কুড়ে হইবে।

তাহার পিতা পরিশ্রমী শিল্পী, গুলি গাঁজা খাইবার হুকার নল তৈরি তাহার ব্যবসা। সে মোরগের সঙ্গে জাগিয়া আপনার খরাদকলে নলের গায়ে নক্সা কোঁদে। সে বেটার বায়না শুনিয়া তো অবাক! সে বলিল,—ইয়া আল্লা! আলসে কুড়ে হবি, তুই? ......তোফা মতলব! বহুত আচ্ছা বাচ্চা! জিতা রহ!

—হাঁ বাবা, আমি সিদি লাকদারের মতন নাম করব!

—আরে তোবা তোবা! এও কি একটা কথা! তুই হলি আমার বেটা, তুই বাপের ব্যবসা শিখে খরাদ করবি, গুলিগাঁজার নল কুঁদবি। আমরা দুনিয়ার লোককে আলসে কুড়ে বানাই, আর তোর সাধ গেল কিনা নিজে আলসে কুড়ে হতে? পৈত্রিক ব্যবসা তোর ভালো না লাগে, তুই তোর আলি চাচার মতন কাজির দপ্তরখানায় দস্তুর মতো দপ্তরী হবি! কিন্তু আলসে কুড়ে, সে কখনো না। ...... যা যা, মকতবে যা, নইলে দেখেছিস এই আনকোরা কোড়া, এই দিয়ে তোকে বিত্তিয়ে লাল করে দেবো।

কোড়ার কড়াকড়িতে পড়িতে যাওয়ার কড়ার করা ছাড়া তাহার আর গত্যন্তর রহিল না। সে পড়িতে গেল, মকতবে নহে, বাজারের এক রাস্তায়;—একটা গালিচার দোকানের

গাঁটরির আড়ালে সটান চিতপাত হইয়া। চিতপাত পড়িয়া পড়িয়া মুর-বাজারের লণ্ঠনের গায়ে রোদের ঝলকানি, নীল রঙের টাকার তোড়ার ঝনঝনানি, বুকের উপর জরির কাজ-করা জামা জোব্বার ঝকমকানি দেখিয়া শুনিয়া, আর গোলাপ-জলের কার্ব্বার আর ভেড়ার লোমের বস্তার মিঠে কড়া গন্ধ শুঁকিয়া দিনের পর দিন সে ফুঁকিয়া দিতে লাগিল।

কয়েক দিন পরেই পুত্রের কীর্ত্তিকাহিনী পিতার নিকট পৌঁছিল। সে চীৎকার করিয়া আস্ফালন করিয়া আল্লার নামে গালাগালি করিয়া দোকানের পুঁজিপাটা নল কল্কি সমস্ত একে একে ছেলের পিঠে পিটিয়া পিটিয়া ভাঙিল। পণ্ডশ্রম! মহাজনের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা অসাধারণ! বালক পিতাকে বেদনাকাতর তারস্বরে বলিতে লাগিল—আমি আলসে কুড়ে হব ...... আমি আলসে কুড়ে হব!

এত সাজার পরেও হররোজ সে আপনার কুড়েমির কোণটিতে হাজিরি দিতে লাগিল।

নাচার হইয়া পিতা পুত্রকে বলিল—চল্ নেহাতই যখন আলসে কুড়েই হবি, তখন চল্ তোকে সিদি লাকদারের সাগরেদ করে দিয়ে আসি। সে তোকে কুড়েমিতে তালিম করে দেবে। যতদিন তুই শিক্ষানবিশ থাকবি ততদিন আমিই তোর খোরপোষ চালাব।

পুত্র আনন্দে লম্ফ দিয়া বলিল—সাবাস! বাহবা! তোফা! এই তো আমার বাবার মতন কথা! ভ্যালা মোর বাপরে!

পরদিন প্রভাতেই দুজনে সেই মহাপুরুষ দর্শনে যাত্রা করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিল; ক্ষুর দিয়া আচ্ছা করিয়া টাটকা সদ্য

মাথা চাঁচিয়া, একটু নেবুর তেলে তুলা ভিজাইয়া কানে গুঁজিয়া, আঙুলে আতর মাখাইয়া মধ্যছাঁটা দীর্ঘপ্রান্ত গোঁপে চাড়া লাগাইয়া, দীর্ঘ দাড়িতে মেহেদি পাতার রং মাখাইয়া দুইজনে ফিটফাট হইয়া যাত্রা করিল।

বাগানের দ্বার অবারিত। অভ্যাগত পিতাপুত্র অবাধে ঝোপঝাড় কাঁটাখোঁচা ডিঙাইয়া বাগানে অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু বাগানের মালিকের সন্ধান লম্বা ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে অনেক চেষ্টায় তবে মিলিল; তাহারা দেখিল আঞ্জীর গাছের তলে, উপরে পাখীর নীচে পীঁপড়ের ঝাঁকের মাঝে, আগাছার বিছানায় একটা জরদা রঙের ছেঁড়া-কাপড়ের পুলিন্দা পড়িয়া আছে—সেটা তাহাদিগের আগমনে গেঙাইয়া অভ্যর্থনা করিল। যেখান হইতে আওয়াজ আসিল সেখানটা লালচে কালো কি কালচে লাল, সূক্ষ্ম দর্শনে জানা গেল সেটা সিদি লাকদারের বিপুল দাড়ি আর পীঁপড়ের গাঁধি।

খরাদগর মাজা দুমড়াইয়া কপালে করতল ঠেকাইয়া সসম্রমে সেলাম করিয়া বলিল—হুজুর মেহেরবান ও কদরদান! এই আমার বেটা, খেয়াল ধরেছে আলসে কুড়ে হবে; এ-কে কত করে' বুঝিয়ে বললাম আলসে কুড়ে হওয়া কেবলমাত্র সিদি লাকদার আপনাকেই সাজে, গরীবের ছেলের পক্ষে এমন দুরাশা ঘোড়া-রোগের চেয়েও সর্ব্বনেশে! কিন্তু এ একেবারে নাছোড়বান্দা! তাই হুজুরের দরবারে নিয়ে এসেছি, আপনি মেহেরবানি করে' পরীক্ষা করে' দেখুন এর আলসে কুড়ে হবার মতন হিম্মত ও হুনর আছে কি না।

সিদি লাকদার কোনো কথা না বলিয়া তাহাদিগকে ঘাসাসনে

বসিতে ইসারা করিল। পিতা বসিল, পুত্র ঘাসের উপর একেবারে শুইয়া পড়িল! বাঃ! কি চমৎকার সিদ্ধির সঙ্কেত! ইহাই তাহার সফলতার প্রথম প্রধান ও প্রবল লক্ষণ! বায়নার নমুনাতেই সিদি লাকদার সাগরেদের উপর খুসি হইয়া গেল।

তিনজনেই নির্ব্বাক নিস্পন্দ। ঠিক দুপুর বেলা। ঝাঁ ঝাঁ রোদ, আর কাঠফাটা গরম। কমলা আর বাতাবি লেবুর ফুলের গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রার মতো বহিয়া আসিতেছিল। আগাছার ডগায় ডগায় শুষ্ক সূটীগুলি বাতাসে নাড়া পাইয়া ঝম ঝম ঝুনুর ঝুনুর করিয়া বাজিতেছিল আর মাঝে মাঝে এক একটা ফট ফট করিয়া ফাটিয়া বীজগুলি ঝর ঝর করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। গাছে গাছে পাখী পাখা মেলিতেছিল আর বুজিতে-ছিল। পাকা পাকা আঞ্জীর আর খেজুর ডালে ডালে ঠেকিয়া ঠেকিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল। জলের নহর ঘাসের বনে কুল কুল করিয়া বহিতেছিল। চারিদিকে ঘুমের আলস্যের আরামের বিশ্রামের যেন একটা ঘোর লাগিয়াছিল। খরাদগর বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছিল। সিদি লাকদার হাত বাড়াইয়া যে ফলটার নাগাল পাইতেছিল তুলিয়া তুলিয়া মুখে পুরিতেছিল। ছোঁড়া কিন্তু নির্ব্বিকার উদাসীন নিশ্চল নিস্পন্দ। একটা গাছপাকা ডগডগে আঞ্জীর ছোঁড়ার কানের কাছে পড়িল, মুখ ফিরাইলেই তাহা মুখে যায়, কিন্তু সে তবু নিশ্চল। ওস্তাদ শুইয়া শুইয়া মুগ্ধ নেত্রে সাগরেদের এই নবাবী ধরণের আশ্চর্য্য মধুর কুড়েমি উপভোগ করিতে লাগিল।

এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা এমনি ভাবেই চুপচাপ কাটিয়া গেল। কর্ম্ম-কুশল খরাদগরের নিকট এই "বৈঠক" (?) নিতান্তই দীর্ঘ বলিয়া

বোধ হইতে লাগিল। তবু সে নীরব নিশ্চল, আসনপীঁড়ি হইয়া বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে পড়িতে পড়িতে এক একবার জাগিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখে ওস্তাদ-সাগরেদের লীলা আর মহাভাব! ওস্তাদের আস্তানার গরম বাতাস পাকা ফলের গন্ধভারে অলস মন্থর, আপনার চারিদিকে আলস্য ছড়াইতেছিল।

হঠাৎ একটা মস্ত বড় খুব পাকা আঞ্জীর টপ করিয়া ছোকরার ঠোঁটের উপর পড়িয়া চেপ্টা হইয়া গেল। ইয়া আল্লা! এক গণ্ডূষ মধুর মতো আঞ্জীরটির কিবা রং, কিবা স্বাদ, আর কিবা চমৎকার গন্ধ! জিভ বাহির করিয়া মুখের মধ্যে টানিয়া লওয়ার ওয়াস্তা! কিন্তু ছোকরার ঠোঁটের উপর মধুর প্রলেপের মতো আঞ্জীরটি লাগিয়াই রহিল, জিভ দিয়া টানিয়া লইতেও তাহার ক্লেশ বোধ হইতেছিল। থাকিতে থাকিতে লোভ যখন প্রবল হইয়া উঠিল তখন সে পিতাকে চোখের ইসারা করিয়া গেঙাইয়া গেঙাইয়া বলিল—"বাবা, 'গোঁপের ওপর আঞ্জীরটি নামিয়ে দাও তো খাই' !"

এই কথা শুনিবামাত্র সিদি লাকদার মুখের গ্রাস হাতের মুঠার পাকা আঞ্জীরটি টানিয়া ফেলিয়া দিয়া এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বালকের পিতাকে সক্রোধে তর্জ্জন করিয়া বলিল—"বে-আক্কেল আহাম্মক! এই ছেলেকে এনেছিস আমার সাগরেদ করে দিতে!"

তারপর ছোকরার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া তাহার চরণ-তলের মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া সবিনয়সম্ভ্রমে বলিল—"প্রভু, গুরু, তুমি কুঁড়ের বাদশা, আলসের ওস্তাদ, এই সাগরেদের প্রণাম গ্রহণ কর!......"

পূজার ঘণ্টা

ছোট গাঁ খানিতে একটি পুরাণো মন্দির আর একজন পুরাণো পূজারী ছিল। মন্দিরের পূজা-আরতির ঘণ্টাটি ছিল ফাটা; তাহাতে শব্দ হইত ঠিক যেন বুড়ীর কাশির মতন। সেই শ্রুতিকটু শব্দ শুনিলে ক্ষেতের কাজে কৃষাণের আর উৎসাহ থাকিত না; অকারণ দুঃখের ভারে মন দমিয়া যাইত।

পূজারীর বয়স হইলেও চেহারাটি ছিল বেশ আঁটোসাঁটো গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট। শিশুর মতো সদানন্দ তাঁহার চেহারাটি; বুড়ো থুরথুরো, তবু মুখখানিতে দেহ-মনের স্বাস্থ্যের লালিমা মাখানো; গাঁয়ের মেয়েদের হাতের যত্নে পাকানো সূতার নুটি-গুলির মতো কোঁকড়া কোঁকড়া শাদা ধবধবে চুলের গুচ্ছে তাঁহার মুখখানি ঘেরা।

তাঁহার অমায়িক ব্যবহার আর দয়াযত্নের জন্য যজমানেরা তাঁহাকে বড় ভালো বাসিত, ভক্তি করিত।

পূজারীর দীক্ষা লওয়ার বাৎসরিক দিন। পঞ্চাশ বৎসর আগে বৃদ্ধ তাঁহার ভরা যৌবনে এই ত্যাগের ব্রত স্বীকার করিয়া দীক্ষা লইয়াছিলেন। যজমানেরা স্থির করিল এই বিশেষ দিনে তাহাদের পূজারীকে বিশেষ কিছু উপহার দিবে।

গোপনে বাড়ী বাড়ী চাঁদা তুলিয়া একশ টাকা জোগাড় করিয়া তাহারা পূজারীকে আনিয়া দিয়া কহিল—বাবাঠাকুর, শহরে গিয়ে আপনি নিজে দেখে পছন্দ করে একটা নতুন ঘণ্টা কিনে নিয়ে আসুন।

পূজারী বলিলেন—বাবা, তোমাদের কল্যাণে......ভগবানের আশীর্ব্বাদে······নতুন ঘণ্টা......

বৃদ্ধ গুছাইয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না, তাঁহার চিত্ত আনন্দে ভাবে ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি শুধু আপন মনে বলিতে লাগিলেন—দয়াল ঠাকুর, তোমার সেবা করতে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছ, ধন্য করেছ !...

*

* *

পরদিন প্রভাতে পূজারী ঘণ্টা কিনিতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। পথের দুধারে বিচিত্র বৃক্ষলতাগুল্ম ও পশুপক্ষীর প্রাণহিল্লোল রবিকিরণে ঝলমল করিতেছিল—চারিদিকে শুধু প্রাণের, আনন্দের, বর্ণগন্ধগানের মেলা লাগিয়া গিয়াছে—পথের ধূলি পর্য্যন্ত প্রাণে স্পন্দিত !

আর তাহার মধ্যে সেই বৃদ্ধ পূজারীর কানে নূতন ঘণ্টার ভবিষ্যৎ মধুর সঙ্গীত থাকিয়া থাকিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। ভগবানের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের আনন্দে মুগ্ধমনে ভজন গাহিতে গাহিতে বৃদ্ধ পথ হাঁটিতেছিলেন।

শহরে পৌঁছিবার মাঝামাঝি পথে পূজারী দেখিলেন একটা ঘোড়া মরিয়া পড়িয়া আছে, আর তাহার কাছে বসিয়া একজন বুড়া ও একজন বুড়ী হাপুস-নয়নে ঘোড়ার শোকে কাঁদিতেছে।

তাহারা বেদে। তাহাদের কাপড় ময়লা, আগাগোড়া তালি আর রিফুর নক্সা-কাটা।

পাশের পগার হইতে একটি তরুণী বেদিনী, পাতাল হইতে নাগকন্যার মতো, হঠাৎ বাহির হইয়া পূজারীর নিকট আসিতে

আসিতে বলিতে লাগিল—বাবাঠাকুর বাবাঠাকুর, দান কর বাবা, কিছু দান কর, পুণ্যি হবে, পুণ্যি হবে !

তরুণীর কণ্ঠের স্বর বড় মধুর বড় মোলায়েম ; বলার ভঙ্গিটি গানের মতো তালে তালে। বেদিনীর গায়ের রং টাটকা-মাজা তামার পুষ্পপাত্রের মতো। পোষাক পরিচ্ছদ বুড়াবুড়ীর চেয়ে কিছু ভালো নয় কিন্তু তবু তাহার ঐশ্বর্য্যের কমি ছিল না—চোখের তারা দুটি তার কালো মখমলের টুকরা, গাল দুটি তার ননীর ডেলা, আর ঠোঁট দুখানি পাকা পিচ; তাহার যৌবন-নিটোল বুকের উপর নীল উল্কির পত্রলেখা, তামার তারে কালো চুলের রাশি পেখম তুলিয়া চূড়া করিয়া বাঁধা—পাপড়ির বেষ্টনে পদ্মকোষের মতন আতাম্র মুখখানি তাহার মধ্যে টুলটুল করিতেছে।

পূজারী গতি স্থগিত করিয়া টাকার গেঁজে বাহির করিলেন। গেঁজে হাতড়াইয়া একটা ডবল পয়সা তুলিয়া তরুণীকে দিতে গেলেন। তাহার মুখ দেখিয়া আর তাহাকে পয়সা দেওয়া হইল না। বুড়া তরুণীর পরিচয় লইতে লাগিলেন।

তরুণী বেদেনী বলিল—বাবাঠাকুর, আমরা বড় গরিব গো বড় গরিব। পেট ভরে খেতে পাই না, শীতে কাপড় পাই না। আমার এক ভাই ছিল, তাকে ধরে কয়েদ করেছে, সে নাকি একটা মুরগী চুরি করেছিল। সেই আমাদের রোজগার করে খাওয়াত। সে নেই—আমাদের দুদিন খাবার জোটেনি।

পূজারী ডবল পয়সাটি গেঁজেতে রাখিয়া একটা টাকা তুলিলেন।

বেদিনী বলিয়াই যাইতেছিল—আমি বাজি করতে জানি;

আমার মা হাত গুণতে পারে। কিন্তু চৌকিদার গাঁয়ে কিংবা শহরে কোথাও আমাদের খেলা দেখাতে দেয় না, আমাদের কষ্টের একশেষ হয়েছে। তারপর আবার আমাদের ঘোড়াটা মরে গেল—আমরা যে কি করে’ কি করব?

পূজারী জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, তা তোমরা কোথাও চাকরি বাকরি করনা কেন?

—লোকেরা যে আমাদের বিশ্বাস করে না। আমাদের ঘরে ঠাঁই দিতে ভয় পায়; ঢেলা ছুঁড়ে তাড়া করে। আর আমরাও তো কোনো কাজ জানিনে; ভবঘুরে আমরা, জানি শুধু এ গাঁ ও গাঁ করে ঘুরে বেড়াতে। যদি আমাদের একটা ঘোড়া থাকত আর কাপড় চোপড় কেনবার কিছু টাকা থাকত, তা হলে আমরা বাঁচবার একটা পথ করতে পারতাম। এখন মরা ছাড়া আর উপায় নেই।

পূজারী টাকাটি গেঁজেয় রাখিয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন —তুমি ভগবানকে ধন্যবাদ জানাও?

বেদেনী বলিল—কেন জানাব না? সে ভদ্রলোক যদি আমাদের সাহায্য করে অবিশ্যি তাকে ধন্যবাদ জানাব।

পূজারী জামার বুকের মধ্যে হাত ভরিয়া অতি সঙ্গোপনে রক্ষিত তাঁহার যজমানের দেওয়া একশ টাকার তোড়াটি হাতে তুলিয়া তাহার ভার আন্দাজ করিতে লাগিলেন।

বেদেনী তাহার কোমল চোখের তরল দৃষ্টি পূজারীর মুখ হইতে একবারও নামায় নাই, সেই নাগিনীর মতো যাদুকরা তাহার দৃষ্টি!

পূজারী প্রশ্ন করিলেন—তুমি ধর্ম্মশীলা তো?

—ধর্ম্ম ?—বলিয়া বেদেনী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

পূজারী বলিলেন—আচ্ছা বল—"ভগবান, তোমায় আমি ভালো বাসি।"

তরুণী দুই চোখে জল ভরিয়া লইয়া বলিল—না না, বুড়ো বাবাঠাকুর, আমি তোমায় ভালো বাসতে পারব না, আমি আর একজনকে যে ভালো বাসি।

পূজারী মের্জাইয়ের বন্ধ খুলিয়া বুকের ভিতর হইতে টাকার তোড়াটি বাহির করিলেন।

বেদেনী চিলের মতো ছোঁ মারিয়া তোড়াটি ছিনাইয়া লইয়া ছুটিয়া পলাইতে পলাইতে বলিয়া গেল—বুড়ো ঠাকুর তোমায় ভালো বাসব গো খুব ভালো বাসব! তুমি খাসা লোক!

বুড়াবুড়ি তখনো পগারের আলের উপর বসিয়া ঘোড়ার শোকে হাপুস-নয়নে কাঁদিতেছিল।

*
* *

পূজারী শহরের দিকেই চলিতে লাগিলেন। কোথায় কেন যাইতেছেন সে হুঁস তাঁহার ছিল না; তিনি তখন ভাবিতেছিলেন যে ভগবানের এ কী নিয়ম, তাঁহারই সৃষ্ট কত প্রাণী কী বিষম দুঃখে কষ্টে নিমজ্জিত হইয়া আছে। পূজারী ভগবানের কাছে মনে মনে এই প্রার্থনা করিতেছিলেন যে, এই যে ধর্ম্মজ্ঞানহীনা বেদেনী, ইহার অন্তর, হে ঈশ্বর, তোমার প্রকাশে উজ্জ্বল আলোকিত করিয়া তোলো। 'যে তোমারে ডাকে না হে তারে তুমি ডাক ডাক!' আহা অমন সুন্দর মেয়েটি!

হঠাৎ পথের মাঝে তাঁহার হুঁস হইল যে তাঁহার শহরে

যাওয়ার কষ্ট বেদেনী টাকার ভার হরণ করিয়াই লাঘব করিয়া দিয়া গিয়াছে—তাঁহার শহরে যাইবার আর প্রয়োজন নাই।

খুলা পায়েই বৃদ্ধ আবার গৃহের দিকে ফিরিলেন।

এখন তাঁহার ভাবনা হইল, একটা বেদেনী ভিখারিণীকে কেমন করিয়া তিনি একেবারে অত টাকা দিয়া ফেলিলেন। সে টাকা তো তাঁহার নিজেরও নয়।

তিনি পা চালাইয়া তাড়াতাড়ি ফিরিতে লাগিলেন; বেদেনীর দেখা পাইলে টাকা ফিরাইয়া লইবেন। সেই জায়গায় ফিরিয়া দেখিলেন শুধু সেই মরা ঘোড়াটা ঠ্যাং উঁচু করিয়া পড়িয়া আছে—বেদেরা একেবারে অন্তর্ধান।

এখন করা যায় কি। তিনি যে ভয়ানক পাপ করিয়াছেন তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই। যজমানের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা, গচ্ছিত ধন অপহরণ, দেবতার ধন অপব্যয়!

এই ব্যাপারের পরিণাম চিন্তা করিয়া ভয়ে তাঁহার শরীর মন শিহরিয়া উঠিতেছিল। ব্যাপারটা এখন ঢাকা যায় কেমন করিয়া? কি উপায়ে এই অন্যায়ের প্রতিকারই বা করা যায়? একশ একশ টাকা কেমন করিয়াই বা জোগাড় হইবে? লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিবে তখনই বা কি বলা যাইবে? আর নিজের আচরণই বা কেমন করিয়া লোকের কাছে প্রকাশ করা যাইবে?

মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল। কালো মেঘের গায়ে ঝাপসা গাছগুলো দানবের মতো দাঁড়াইয়া আছে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামিল। জগতের দুঃখচিন্তায় পূজারীর প্রাণ কাতর হইয়া উঠিল।

পূজারী গাঁয়ে ফিরিয়া গেলেন, ভাগ্যে ভাগ্যে কেহ তাঁহাকে দেখিল না।

মন্দিরের বুড়ী ঝি জিজ্ঞাসা করিল—কি বাবাঠাকুর, এর মধ্যে ফিরে এলে ? শহরে গেলে না ?

পূজারী মিথ্যা বলিলেন।—না, যাবার গাড়ী পেলাম না, আর একদিন যাব এখন।......কিন্তু, একটা কথা, আমি যে ফিরে এসেছি একথা এখন কাউকে বোলো না, বুঝলে ?

পরদিন প্রভাতে পূজারী মন্দিরে পূজা করিলেন না। নিজের ঘরটিতে বন্ধ হইয়া রহিলেন।

পরদিন ভিন্ গাঁ হইতে যজমান আসিল, মুমূর্ষুর প্রায়শ্চিত্ত করাইতে পূজারীকে যাইতে হইবে।

ঝি ভিন্ গাঁয়ের যজমানকে বলিল—বাবাঠাকুর শহরে গেছেন, এখনো তো তিনি ফেরেন নি।

—ঝি জানে না ; এই যে আমি ফিরে এসেছি।—পূজারী দ্বার খুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

*

* *

ভিন্ গাঁয়ে যাইবার পথে দুএকজন যজমানের সঙ্গে পূজারীর দেখা হইতে লাগিল।

—বাবাঠাকুর যে ! আজ্ঞে প্রাতঃপ্রণাম হই। শহরে যেতে আসতে কোনো ক্লেশ হয়নি তো ?

পূজারী আবার মিথ্যা বলিলেন—ক্লেশ ? না বাবা, পথে কোনো ক্লেশই হয়নি।

—আর সেই ঘণ্টাটা ? সে কেমন হল ?

পূজারী আবার মিথ্যা বলিলেন ; তখন তাঁহার আর দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান ছিল না।

—ঘণ্টা ? সে আর কি বলব বাবা, সে চমৎকার! আওয়াজ, সে আর কি বলব, যেন রূপোর বাদ্য। একটি টুসকি মারলে অনেকক্ষণ তার আওয়াজ বাজে, শিগ্‌গির থামতে চায় না, আর সে আওয়াজ তেমনি মিঠে।

—কবে আমরা দেখতে পাব ?

—শিগ্‌গিরই দেখতে পাবে বাবা, শিগ্‌গিরই দেখতে পাবে। কিন্তু ঘণ্টার গায়ে একশ আট ঠাকুরের নাম খুদতে হবে, পঞ্চগব্য দিয়ে শোধন করে, ভূতশুদ্ধি আসনশুদ্ধি করে তবে তো টাঙানো হবে, অমনি টাঙালেই তো আর হল না।

*
* *

পূজারী মন্দিরে ফিরিয়া আসিয়াই ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন—আচ্ছা ঝি, আমার এই আসন বাসন, চৌকি টৌকি যা-কিছু আসবাবপত্তর আছে সব যদি বেচে ফেলি, তাহলে কি একশ টাকা হয় না ?

—হ্যাঁঃ একশ টাকা! তোমার তো ভারি ঐশ্বর্য্যি, বেচলে একশ পয়সাও দাম হবে না।

—তবে ঝি, আজ থেকে আমি আর হবিষ্যিতে ঘি দুধ খাব না ; পেটে সহ্য হয় না।

বুড়ী ঝি আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—বাবাঠাকুর তুমি কি বলছ ? দিনান্তে এক মুঠো হবিষ্যি তাতে ঘি দুধ খাবে না ? এও কি একটা কথা হল ? ... তোমার ব্যাপারখানা কি খুলে বল দেখি ? হয়েছে কি ? সেই যেদিন থেকে শহরে যেতে যেতে ফিরে এসেছ, সেদিন থেকে কি হয়েছে তোমার ? ...

ঝি প্রশ্ন করিয়া পূজারীকে এমন ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল যে বৃদ্ধ তাহার নিকট হইতে আর কিছুই গোপন রাখিতে পারিলেন না।

—আ! এ আর আশ্চর্য্য কি? তোমার যে দয়ার শরীর, তাইতেই তোমায় খেয়েছে। তা এর জন্যে ভেব না বাবাঠাকুর। যতদিন না টাকার জোগাড় হয় লোককে ঠেকিয়ে রাখবার বোঝা বোঝাবার ভার আমার রইল। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

শীঘ্রই গ্রামময় রটিয়া গেল—ঘণ্টার গায় একশ আট ঠাকুরের নাম খোদাই করিতে গিয়া ঘণ্টা ফাটিয়া গিয়াছে; এজন্য তাহা গলাইয়া আবার ঢালাই করিতে হইবে। তারপর নূতন করিয়া ঢালা খোদা হইলে প্রধান মোহান্তকে দিয়া শোধন করাইতে হইবে; নূতন ঘণ্টা প্রতিষ্ঠা, সে তো আর অমনি মুখের কথা খসাইলেই হয় না।

ঝিয়ের রটনায় পূজারী বাধা দিলেন না, কিন্তু অন্তরে তাঁহার বেদনা জমিতেছিল। একে তো নিজের মিথ্যা কথার বোঝা তাঁহার মনকে অহরহ পীড়া দিতেছিল তাহার উপর এইসব মিথ্যা রটনার জন্য তিনি নিজেকেই দায়ী বলিয়া বোধ করিতেছিলেন। যজমানের ন্যস্ত ধন নষ্ট করার সঙ্গে এইসব মিথ্যা প্রবঞ্চনা পাপের পর্ব্বতের মতো তাঁহাকে চারিদিক হইতে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। বৃদ্ধ এতদিনে জরার ভারে ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিলেন; স্বাস্থ্য ও আনন্দের লালিমা হারাইয়া গাল দুটি বসিয়া গেল, চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

*

* *

পূজারীর দীক্ষাদিন নিরুৎসবেই কাটিয়া গেল; ঘণ্টা প্রতিষ্ঠাও